৩। পঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)

পঞ্চানন তর্করত্ন উত্তর চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়ায় এক পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিত পরিবারে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতার নাম নন্দলাল বিদ্যারত্ন ও শশীমুখী দেবী। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি পড়া শেষ করে বাড়ীতে টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁর নব্যন্যায়-শিক্ষক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম তাঁকে তর্করত্ন উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তিনি বিনা পয়সায় বাড়িতে ছাত্রদের রেখে টোল চালাতে পারেননি। তাই পরে তিনি পিতৃশিষ্য ইন্দোরের রাজবৈদ্য অমৃতলাল রায়ের কাছে যান। ইন্দোরের রাজা তুকোজি হোলকারের ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁর সভাপণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিজয়ী হন। কিন্তু সেই পণ্ডিতেরা তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করায় তিনি ইন্দোর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অমৃতলাল তখন তাঁকে পার্শ্ববর্তী রাজ্য 'ধারে' পাঠিয়ে দেন। ধারের রাজপণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর তর্ক হয়। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে ৯০ টাকা পুরস্কার ও নানা উপহার দেন। সেসব নিয়ে তিনি স্বগৃহে ফিরে আসেন। তারপর তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার গুণে তিনি বঙ্গবাসী শাস্ত্রপ্রচার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন।

ক্রমে তাঁর সম্পাদনায় রামায়ণ, ১৮টি সংহিতা ও ১৮টি পুরাণের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বর্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারত সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্য নিয়ে তিনি দেবীভাগবৎ, হরিবংশ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, তন্ত্রসার, মহানির্বাণতন্ত্র এবং বিভিন্ন কাব্য, নাটক ও দর্শনশাস্ত্র সম্পাদন করেন। টীকাভাষ্য রচনা করে তিনি শক্তিবাদকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দান করেন। তারপর তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপর দেবীভাষ্য রচনা করেন। এছাড়া তিনি বেদান্তসূত্রের উপর শক্তিভাষ্য, শক্তিবাদসার প্রভৃতি রচনা করেন। তিনি জন্মভূমি নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। বঙ্গবাসী পত্রিকাতেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ লিখেছেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করে। পরে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তারপর পণ্ডিত মালব্যের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে নিখিল ভারত পাশ্চাত্য বৈদিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান বক্তৃতা দেন।

৫। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (মহামহোপাধ্যায়)

শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বাইশে অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের কোটালি-পাড়ার অন্তর্গত উণশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। হরিদাস কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণশাস্ত্রী, সিদ্ধান্তবাগীশ ইত্যাদি নানা উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলাদেশ ও বারাণসী থেকে তিনি মহাকবি, মহোপদেশক, ভারতাচার্য ইত্যাদি উপাধিতেও ভূষিত হন।

হরিদাস ছাত্রাবস্থাতেই সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি নাটক ও খণ্ডকাব্য রচনা করেছিলেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং সিদ্ধান্তবিদ্যালয় নামে একটি টোল খুলে পড়াতে থাকেন। তারপর তিনি মহাভারতের 'ভারতভাবদীপ' নামক টীকা রচনা করতে আরম্ভ করেন। নীলকণ্ঠের ভারতকৌমুদী টীকাসহ তাঁর টীকার মূল ও বঙ্গানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। একুশ বছরের পরিশ্রমে প্রায় ২০ হাজার পৃষ্ঠায় তিনি মহাভারত সম্পাদন করেন। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি। এছাড়া তিনি স্মৃতি, অলঙ্কার, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ছটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার বিষয়ক ১৬টি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর তিনি টীকা রচনা করে বঙ্গানুবাদ সহ সেগুলি মুদ্রিত করেছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থটিও তিনি টীকা ও অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি রুক্মিণীহরণ মহাকাব্য, বিয়োগবৈভবম্ নামক খণ্ডকাব্য, জানকীবিক্রম নাটক, বিরাজ-সরোজিনী নাটক প্রভৃতি আটটি কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। এগুলি মূলত প্রাচীন ধারায় রচিত হলেও কোথাও কোথাও নতুন ধারারও সন্ধান মেলে। এসব ছাড়া তিনি বৈদিকবাদ মীমাংসা, ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়, যুধিষ্ঠিরের সময়, গীতার প্রক্ষিপ্তবাদের প্রতিবাদ প্রভৃতি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধও রচনা করেন। স্মৃতিব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত নিদর্শনরূপে তাঁর স্মৃতিচিন্তামণি নিবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করে। স্বাধীন ভারতের সরকার ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১২৫০ টাকা বার্ষিক সাম্মানিক দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

৬। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ নাটকের শেষে নিজের বংশপরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, তিনি সিদ্ধ গৌতম মুনির কুলে জাত সুবিখ্যাত দার্শনিক তথা নৈয়ায়িক পঞ্চানন তর্করত্নের পুত্র। তাঁদের নিবাস পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির কাছে ভাটপাড়ায় (ভট্টপল্লীতে)। তাঁর প্রকৃত পদবী ভট্টাচার্য। তিনিও ছিলেন একজন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও অধ্যাপক। প্রায় ষাট বছরের সাহিত্য জীবনে শ্রীজীব নানা ধরনের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাটক রচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাঁর শতবার্ষিকম্, গিরিধরসংবর্ধনম্, চিপিটকচর্বণম্, বিধিবিপর্যাসম্, চণ্ডতাণ্ডবম্, ক্ষুতক্ষেমীয়ম্, রাগবিরাগম্, মহাকবি-কালিদাসম্, পুরুষপুঙ্গবঃ, বিবাহবিড়ম্বনম্, শ্রীশঙ্করাচার্যবৈভবম্, চৌরচাতুরীয়ম্, সিন্ধু-সৌবীরসংগ্রামম্, সাম্যসাগর-কল্লোলম্, স্বাতন্ত্র্য-সন্ধিক্ষণম্ প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি নাটক বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছে। উপলক্ষ্য ছিল শঙ্করাচার্যের আগমন, উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহ, পুণার ধর্মসম্মেলন, দিল্লির বিশ্বশান্তি সম্মেলন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সারস্বতোৎসব প্রভৃতি। অভিনয় হয়েছে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে, হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের মঞ্চে; আবার কখনও পুণায়, কখনও উজ্জয়িনীতে, কখনও দিল্লিতে।

শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, হিট্‌লার, মুসোলিনী, স্তালিন প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনেও নানা নাটক চিত্রিত করেছেন। তার জন্য তিনি যথেষ্ট পড়াশুনো করেছেন। যেমন, স্তালিনের চরিত্রচিত্রণের জন্য তিনি ই. ইয়ারোশ্লভস্কি-বিরচিত '*Landmarks in the life of Stalin*' বইটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এইসব চরিত্রের পাশাপাশি তিনি লোভ, ক্রোধ, হিংসা, ধর্ম প্রভৃতি প্রবৃত্তিসমূহকেও চরিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তার অপপ্রয়োগে লক্ষ লক্ষ মানুষের নানা ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর কথাও তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, যন্ত্রবিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ না করলে 'শতবর্ষান্তরে পৃথ্বী নূনং ধ্বস্তা ভবিষ্যতি'। 'চৌরচাতুরীয়ম্' নাটকে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজে ছোটোখাটো চোরেরা শাস্তি পায়, কিন্তু বড় বড় চোরেরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষুতক্ষেমীয়ম্ নাটকে তিনি জীবে প্রেমের বার্তা দিতে চেয়েছেন।

শ্রীজীবের নাটকগুলিতে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছে, নাটকগুলি কালের দর্পণ হয়ে উঠেছে। রচনাশৈলীতে নান্দী, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য ইত্যাদি প্রাচীন নাট্যতাত্ত্বিক ধারা অনুসরণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম তিনি মানেননি। তাই তাঁর কোন কোন নাটককে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যেমন, 'রাম-নাম-দাতব্যচিকিৎসালয়ম্'। এটিকে কোনো শ্রেণীভুক্ত করা যায় না বলে তিনি শুধু 'রূপকং সমাপ্তম্' লিখেছেন।

(১) স্যার্ উইলিয়ম জোন্স

বিখ্যাত ভারতবিদ্যাবিদ উইলিয়ম জোন্স ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ। তিনি রয়াল সোসাইটির উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। জোন্সের মাতৃদেবীও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন। অবশ্য জন্মের মাত্র তিন বছর পরেই জোন্স পিতৃহারা হন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হ্যারোর প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। সেখানে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অনেকগুলি কবিতা এবং একটি কাব্য রচনা করেন ; তাঁর লোকোত্তর প্রতিভায় অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যেই তিনি ইংরাজী, ফরাসী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। পরে তিনি জার্মান ও চীনা ভাষাও শেখেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিড্‌ল টেম্প্‌লে আইন পড়া শুরু করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেই ফরাসী ভাষায় প্রাচ্যভাষার কবিতা সম্বন্ধে একটি আলোচনা হাফিজের কয়েকটি গীতিকবিতার অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত ফারসী ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একমাত্র লন্ডন থেকেই এই বইটির এগারোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষার কিছু কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করে তিনি একটি কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁর কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনব্যবসা আরম্ভ করেন। এই বছরেই তিনি এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার কবিতার ল্যাটিন অনুবাদ ক'রে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। আইন ও প্রশাসন বিষয়ক রচনাতেও তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি ভারতে একটি উপযুক্ত পদ লাভ করতে চাইছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে তিনি সরকারের বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি কোলকাতার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদ লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে নাইট (স্যর্) উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর তিনি তাঁর প্রেমিকা উইঞ্চেষ্টারের ডীন ডঃ জোনাথন শিপলের কন্যা আনা মেরিয়া শিপলকে বিবাহ করেন। সুখী দম্পতি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতায় পদার্পণ করেন এবং ডিসেম্বর মাসে জোন্স বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও হৃদয়বান বিচারকরূপে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে এই পদে সমাসীন ছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা বিদ্যোৎসাহী জোন্সের জীবনের পরম অভীষ্ট ছিল। ভারতে এসে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। তার আগে তিনি অন্য ২৭টি ভাষা শিখেছিলেন। তিনি বুঝলেন যে, প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। তাই তাঁর আমন্ত্রণে ত্রিশজন

ইউরোপীয় কৃতবিদ্য পণ্ডিত ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে কোলকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রবার্ট চেম্বার্স, স্যার জন শোর ও চার্লস উইলকিন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী জোন্স তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটিতে তাঁর বাৎসরিক ভাষণে তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলি, প্রাচীন পারসিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা সমসূত্র থেকে উদ্ভূত একই গোষ্ঠীর ভাষা। জার্মান পণ্ডিত বোপ এই মতটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জোন্স মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এটিই প্রথম ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত নাটক। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যটি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। এটিই সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী ভারতশাসনের সুবিধার জন্য উইলকিন্স মনুসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন। মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অনুবাদের পর তিনি কাজটি ত্যাগ করায় জোন্স বিপুল পরিশ্রমে বাকি কাজ শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বইটি *'Institutes of Hindu Law or the Ordinances of Manu according to glossary of Culluca'* নামে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাঁর রচিত *'Mohammedan Law of succession of property to intestates and Mohammedan Law of inheritence'* প্রকাশিত হয়।

বিচারকের কাজের ফাঁকে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে এবং নিজের লেখাপড়ার কাজে সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল কোলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশী-বিদেশী বহু ব্যক্তিই আত্মীয়বিয়োগ-বেদনা অনুভব করেন। উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়।

(২) স্যার চার্লস উইল্কিন্স

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সমারসেটশায়ারে এক দরিদ্র পরিবারে চার্লস উইল্কিন্স জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ওয়াল্টার্ উইল্কিন্স। দারিদ্র্যের কারণে উচ্চ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটার্'-এর চাকরি নিয়ে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন। কোলকাতায় কিছুদিন চাকরি করার পর তাঁকে মালদহে কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষের সহকারী করে পাঠান হয়। তিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও অধ্যয়নপরায়ণ ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাংলা ও ফারসী ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করেন। এই সময়ে কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী হ্যালহেডের সংস্পর্শে এসে তিনি সংস্কৃত শিখতে আগ্রহী হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

বন্ধু হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ ছাপাবার জন্য দুঃসাহসী উইল্কিন্স বিনা অভিজ্ঞতাতেই বাংলা টাইপ তৈরীর কাজে অগ্রসর হন এবং পঞ্চানন কর্মকার নামে এক

কর্মচারীর সাহায্যে নিজের হাতে ছেনি দিয়ে বাংলা হরফের ছাপ তৈরী করে একপ্রস্থ বাংলা হরফ প্রস্তুত করেন। তার সাহায্যেই বইটি ছাপা হয়। তাই তাঁকে বাংলা টাইপের জন্মদাতা বলা যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে পঞ্চানন কর্মকারের অবদানও স্মরণীয়। উইলকিন্স পরে ফারসী হরফও তৈরী করেন।

উইলিয়ম জোন্স কোলকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে ভারতে এসে উইলকিন্সের সহায়তাতেই অল্পদিনের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী উইলিয়ম জোন্সের উদ্যোগে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণার কেন্দ্ররূপে কোলকাতায় যে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ত্রিশজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের মধ্যে উইলকিন্স অন্যতম। সোসাইটি যাঁদের কাছে সর্বাধিক ঋণী, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতমরূপে স্বীকৃত। ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস তাঁকে বন্ধু বলতেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ উইলকিন্সের জীবনের এক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে লণ্ডন থেকে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপের পক্ষে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অতুল ঐশ্বর্যের সম্মানলাভ সম্ভব হয়েছিল। স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন। তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রুশ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্স পঞ্চম পালরাজ বিগ্রহপালদেবের একটি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন। পরে তিনি দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিপিরও পাঠোদ্ধার করেন। এইসব লিপির সাহায্যে তিনি ভারতের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করেন। সুকঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান। সেখানে তিনি দেবনাগরী হরফ তৈরী করেন এবং নিজের বাড়িতেই একটি ক্ষুদ্র মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। তার আগে ইউরোপে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

উইলকিন্স সংস্কৃত হিতোপদেশ ও মহাভারতের শকুন্তলার উপাখ্যানের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করে স্বহস্তে খোদিত দেবনাগরী হরফে নিজের ছাপাখানায় ছাপিয়ে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি সংস্কৃত-শিক্ষার্থিগণের কাছে প্রভূত সমাদর লাভ করে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষার ধাতু সম্বন্ধে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পতনের পর তাঁর বিশাল পাণ্ডুলিপিসংগ্রহ কোম্পানী লণ্ডনে নিয়ে গেলে সেগুলিসহ লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া অফিস'-এ একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী বলে উইলকিন্স তার গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার কোম্পানীর চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর শিক্ষানবিশদের জন্য হেলবেরী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কলেজের পরিদর্শক ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে তাঁর নামও উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যবিদ্যাপারদর্শী বলে তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎসংস্থা 'রয়াল সোসাইটির' সদ্যসপদ লাভ করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

তাঁকে 'ডক্টর অব্ সিভিল্ ল' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁকে 'নাইট' (সার্) উপাধিতে ভূষিত করেন।

উইলকিন্সের দু'বার বিবাহ হয় এবং তাঁর তিনটি কন্যা ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তিনি লণ্ডনে পরলোকগমন করেন।

(৩) হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্

হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন্ লণ্ডনে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও নানা বিষয় তিনি বাড়িতে বসেই আয়ত্ত করে ফেলেন। তাঁর এক নিকট-আত্মীয় সরকারী টাঁকশালের কাজ করতেন। উইল্সন্ সুযোগ পেলেই টাঁকশালে গিয়ে সেখানকার কাজকর্ম মনোযোগ দিয়ে দেখে রসায়নশাস্ত্র, ধাতুবিদ্যা ও মুদ্রাপ্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। দারিদ্র্যের কারণে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেননি। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেন্ট্ টমাস্ হাসপাতালে শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করেন এবং চার বছর পরে তিনি সামরিক চিকিৎসকের পদ লাভ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের সাথে ভারতে আসেন। পথেই জাহাজের একজন ভারতীয় যাত্রীর কাছ থেকে হিন্দুস্থানী ভাষা শিখে ফেলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতায় আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পূর্বার্জিত জ্ঞানের বলে কোলকাতা টাঁকশালের সহকারী 'Assay Master'-এর পদ লাভ করেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন এক কর্মচারী ডাঃ জন লিডেন ছিলেন একজন ভারততত্ত্ববিদ্। তাঁর মাধ্যমে তিনি বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ কোলব্রুকের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর উৎসাহ ও সহায়তায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ভালোভাবে সংস্কৃত শিখে ফেলেন। তাতে খুশী হয়ে কোল্ব্রুক তাঁকে কোলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সম্পাদক নির্বাচিত করেন। ১৮১১ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে থেকে উইল্সন্ সোসাইটির বহু উন্নতিসাধন করেন। এই সময় তিনি 'Quarterly Oriental Journal' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। এতে তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে উইল্সন্ নিজের ইংরাজী পদ্যানুবাদ ও টীকাটিপ্পনীসহ মহাকবি কালিদাসের মূল সংস্কৃত মেঘদূত প্রকাশ করেন। তাঁর পদ্যানুবাদ দেশে-বিদেশে খুবই সমাদৃত হয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টাঁকশালের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের অনুরোধে তিনি বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ সংগঠনের ভার নিয়ে সেখানে কিছুদিন বাস করেন। সেখানে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছ থেকে তিনি তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান পরিপুষ্ট করেন এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেই অমানুষিক পরিশ্রমে সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এক সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন ও প্রকাশ করে তিনি বিদ্বৎসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ইউরোপের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটি ছিল এক নির্ভরযোগ্য অভিধান।

ভারতে শিক্ষাবিস্তারের কাজে উইল্সন্ ছিলেন শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ারের অন্যতম পরামর্শদাতা ও সহায়ক। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাসংক্রান্ত ভার একটি কমিটির হাতে দেওয়া হয়। উইল্সন্ সেই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি কোলকাতার বহুবাজারে এক ভাড়াবাড়িতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ই কলেজ এবং স্কুলসহ হিন্দু কলেজও গোলদীঘির উত্তর পাশে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত য় এবং উইল্‌সন্ সংস্কৃত কলেজের পরিচালনভার গ্রহণ করেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'সিলেক্ট স্পেসিমেন্ অফ্ দি থিয়েটার্ অফ্ দি হিন্দুস্' গ্রন্থটি প্রকাশিত য়। এতে হিন্দু নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক অভিমত, মৃচ্ছকটিক, বিক্রমোর্বশীয়, উত্তররামচরিত, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস ও রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী গদ্যে অনুবাদ এবং আরো ২৩টি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এগুলি ইতিপূর্বে ইউরোপীয় কোনো ভাষায় প্রকাশিত য়নি। গ্রন্থটি ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে সবিশেষ সমাদৃত হয়। অল্পদিনের মধ্যে জার্মান ও ফরাসী ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়। পরে গ্রন্থটির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কোলকাতার সামাজিক জীবনেও উইল্‌সন্ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি বাংলা ভালোভাবে শিখেছিলেন এবং বাংলা ভালো বলতে পারতেন। হিন্দুস্থানী, তামিল প্রভৃতি ভাষাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রসন্নকুমারকে দেশীয় নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার' স্থাপনে তিনি উৎসাহিত করেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু থিয়েটারে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর উদ্বোধনের রাতে তাঁরই নির্দেশনায় তাঁর লিখিত উত্তর-রামচরিতের অনুবাদ অভিনীত হয়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল বোডেন সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারের জন্য তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করলে সেখানে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদের সৃষ্টি হয়। তখন উইল্‌সন্ সেখানে বোডেন অধ্যাপকের পদ লাভ করে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে ভারত ত্যাগ করেন। যাবার আগে তিনি উপযুক্ত বিদায়-সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোম্পানীর গ্রন্থাগারিকের পদ লাভ করে লণ্ডনে বাস করতে থাকেন। লেক্‌চার দেবার সময় সেখান থেকেই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাংখ্যদর্শনের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরাণের সম্পূর্ণ অনুবাদ করে তিনি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ভূমিকা এবং টীকা-টিপ্পনীসমূহে তিনি পুরাণসমূহ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার প্রথম পথিকৃৎ। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে উইল্‌সনের বক্তৃতাগুলির সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন গান্ধারের (আফগানিস্তানের) প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রাজতরঙ্গিণীর ভিত্তিতে 'কাশ্মীরের ইতিহাস' নামে তাঁর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা কোলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সেটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'স্কেচেস্ অফ্ দি রিলিজিয়াস্ সেক্টস্ অফ্ দি হিন্দুস্' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অবলম্বনে পরে অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে এক সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দেই উইল্‌সন্ 'দশকুমারচরিত' সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে কোলকাতা কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় এবং লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে সংস্কৃত কাহিনীগ্রন্থগুলির সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে এই বিষয়ে তিনি পথিকৃতের সম্মান লাভ করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত সংস্কৃত ভাষার একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

ছয় খণ্ডে প্রকাশিত সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের সায়ন-ভাষ্যানুসারে তাঁর রচিত ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ

প্রকাশ উইলসনের এক সুমহান কীর্তি। এর দুটি খণ্ড অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রচলিত রাজস্ব ও বিচারসংক্রান্ত শব্দসমূহের সূচি ও অর্থসহ এক অভিধান তিনি সঙ্কলন করেন এবং সরকারী অর্থে তা প্রকাশিত হয়। তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তার সভাপতি ছিলেন। তারপর আমৃত্যু তিনি এর ডিরেক্টর ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে অস্ত্রোপচারকালে লণ্ডনে তিনি পরলোকগমন করেন।

প্রত্যক্ষভাবে ভারতবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। ভারতবিদ্যার চর্চার ক্ষেত্রে তিনি অগণিত কৃতী শিষ্যমণ্ডলী তৈরী করে গেছেন।

(৪) জেমস্ প্রিন্সেপ

জেমস্ প্রিন্সেপ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতা টাঁকশালের সহকারী Assay Master রূপে ভারতে এসে ১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে কাজ করেন। ১৮৩২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর প্রধান কীর্তি অশোকের লিপির পাঠোদ্ধার। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাজ [illegible] আলোকপাত করে তিনি

(৬) ফ্রীড্‌রিখ্ ম্যাক্সমুল্ল্যর্

ফ্রীড্‌রিখ ম্যাক্সমুল্ল্যর্ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রুশিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আন্‌হাল্ট্ রাজ্যের রাজধানী (বর্তমান জার্মানীর) দেসাউ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উইল্‌হেলম্ স্থানীয় ডিউকের গ্রন্থাগারিক ও কবি ছিলেন। কিন্তু মাত্র চার বছর বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকালেই তিনি সবিশেষ মেধার পরিচয় দেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় গ্রামার স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লাইপ্‌ট্‌সিগ্ থেকে

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি লাইপট্‌সিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিখতে চান। সেইসময় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। অধ্যাপক হারমান ব্রকহাউসের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি অন্যান্য ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বিশ বছর বয়সেই তিনি 'ডক্টরেট' উপাধি অর্জন করেন। তার অল্পকাল পরেই ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'হিতোপদেশ' গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই ভালো করে সংস্কৃত শিখবার উদ্দেশ্যে তিনি বার্লিনে এসে ভাষাবিজ্ঞানী বোপের নিকট সংস্কৃত শিখতে থাকেন। সেইসঙ্গে তিনি অধ্যাপক শিলিং-এর নিকট দর্শন পড়তে থাকেন। তার ফলেই তিনি উত্তর-জীবনে হিন্দুদর্শনে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। বোপের নিকট থেকে তিনি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। বুর্নুফ তাঁর সংস্কৃতানুরাগ দেখে তাঁকে সায়ণভাষ্যসহ ঋগ্বেদের সম্পাদনকার্যে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করেন। পুঁথি কিনবার অর্থ না থাকায় তিনি প্যারীতে ঋগ্বেদ ও তার সায়ণভাষ্যের পুঁথি জোগাড় করে সেসব হাতে লিখে নেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে পুঁথি সংগ্রহের আশায় তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনে আসেন। সেখানে প্রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী বুনসেন এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত হোরেস্ হেম্যান্ উইলসনের চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ম্যাক্সমুল্লর্ সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রকাশের সমস্ত খরচ দিতে সম্মত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় সেটি ছাপার বন্দোবস্ত হয় বলে ম্যাক্সমুল্লর্ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অক্সফোর্ডে আসেন এবং বাকি জীবন ব্রিটিশ প্রজারূপে সেখানেই কাটান। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা-বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জর্জিনা আডিলেড্ নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় সাধ্বী ও গুণবতী ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করেন। তাঁদের এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈদিক কালের সাহিত্য সম্বন্ধে ম্যাক্সমুল্লরের '*History of Ancient Sanskrit Literature*' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এতে আলোচিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই তখন অপ্রকাশিত ছিল। আলোচিত গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য নির্ণয় ছিল গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতে সে সময়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়েও জার্মান ও ধর্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী হওয়ায় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ পাননি। অবশ্য ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকের পদ লাভ করে সংস্কৃত অধ্যাপনার পিপাসা কিছুটা মেটাতে পেরেছিলেন। সেই সময়ে ইংল্যান্ডে ভাষাবিজ্ঞানের কোন চর্চা ছিল না। ১৮৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউসনে ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়ায় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে তাঁর বহু প্রবন্ধ এবং গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তাঁকে ইংল্যান্ডে ও ইংরাজী ভাষায় ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার প্রবর্তকরূপে গণ্য করা হয়। আধুনিক ইউরোপীয় (কেল্‌টিক) ভাষাসমূহের সঙ্গে সংস্কৃতভাষার জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠা ও সেই তত্ত্বপ্রচার তাঁর অন্যতম কীর্তি।

তুলনামূলক ধর্ম ও বিভিন্ন জাতির পুরাণকথাসমূহের তুলনামূলক আলোচনার ব্যাপারেও

ম্যাক্সমুল্যর্ ছিলেন পথিকৃৎ। এ বিষয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের বহু স্থানে বহু বক্তৃতা দেন ও গ্রন্থ রচনা করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত সায়ণভাষ্যসহ ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত শেষ (ষষ্ঠ) খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই কাজে প্রায় তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ বছর ধরে তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়। এতে কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র সভ্যজগৎ সবিশেষ উপকৃত হয়। প্রতীচ্যে ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করেন। ঋগ্বেদের রচনাকাল ও সেকালের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর বহু পরিশ্রমলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও প্রাথমিক আলোচনারূপে সবিশেষ মূল্যবান ও সত্য নির্ণয়ের সহায়ক। নানা স্থান থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে, পাঠভেদ বিচার করে, বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে, প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ পাঠ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে তিনি তা পুস্তকাকারে ছাপান। সায়ণভাষ্য সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন। এজন্য তিনি নিজে ভারতবর্ষে ৮০টি বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদ থেকে অনেক ভারতীয় পণ্ডিতরাও নিজেদের পুঁথির পাঠ-সংশোধন করেছেন। প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই জগদ্ব্যাপী চাহিদার জন্য এই ঋগ্বেদসংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ পুনর্মুদ্রণের জন্য অর্থব্যয় করতে সম্মত না হওয়ায় বিজয়নগরের মহারাজ সেই ভার নিলে ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ম্যাক্সমুল্যর্ চার খণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা থেকে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ ড. উইন্ট্যরনিৎজ্ তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন।

ম্যাক্সমুল্যর্ প্রাচ্যের সমস্ত ধর্মের বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি বিশ জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়ে 'সেক্রেড্ বুকস্ অফ্ দি ইস্ট' নামক গ্রন্থমালারূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থমালার ৫১টি খণ্ডের মধ্যে ৪৮টি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থমালার মোট ৩৩টিই ছিল ভারতের বৈদিক ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ। বাকিগুলি ছিল পারসিক, ইসলাম ও চৈনিক ধর্মসংক্রান্ত। খণ্ডগুলির মধ্যে তিনটির সম্পূর্ণ ও দু'টির আংশিক অনুবাদ তাঁর নিজের। এর মধ্যে ছান্দোগ্য, তলবকার ও ঐতরেয় আরণ্যক, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, বাজসনেয় সংহিতা ইত্যাদির অনুবাদ ছিল। দুই খণ্ডে অনূদিত উপনিষদ্গুলির ভূমিকাও তিনি লিখেছিলেন। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ধর্মপদের সুখাবতী ব্যূহ, বজ্রচ্ছেদিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা-হৃদয়-সূত্রেরও অনুবাদ তাঁর নিজের। আপস্তম্ব ও যজ্ঞপরিভাষাসূত্র নামে স্মৃতিগ্রন্থও তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন। তিনি ইংল্যান্ডেও ইংরাজী ভাষায় তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক। উক্ত গ্রন্থমালা সম্পাদন করে তিনি বিশ্ববিদ্যার এই শাখাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কাজ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।।

দর্শনের মনোযোগী ছাত্র ম্যাক্সমুল্যর্ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত '*Six systems of Indian Philosophy*' নামক ৬০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থে হিন্দু ষড়দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। ঐ বছরেই তিনি '*Ramkrishna—His Life and Sayings*' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তিনি মন্তব্য করেন যে, এরূপ উচ্চ ভাবধারা যে দেশের জনচিত্তে প্রবাহিত, সেদেশের লোককে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা যুক্তিযুক্ত কিনা তা বিবেচনাসাপেক্ষ। বিবেকানন্দ,

কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি শুধু ভারত-বিদ্যা-প্রেমিক ছিলেন না, মহান ভারত-প্রেমিকও ছিলেন। স্বামীজি তাঁর ভারতপ্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভারতের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিলকের কারামুক্তিতেও তাঁর বড় ভূমিকা ছিল।

ভারতবিদ্যাবিদ্‌রূপে পরিচিত হলেও ম্যাক্সমুল্ল্যর্ প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেই সঙ্গে আবার হিতোপদেশ, মেঘদূত, ধর্মপদ, উপনিষদ্ প্রভৃতির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক কান্টের দর্শনগ্রন্থ 'ক্রিটিক্ অফ্ পিওর্ রিজন্'-এরও তিনি ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ইংরাজী তাঁর মাতৃভাষা নয়, বিদেশী ভাষা।

ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাক্সমুল্ল্যর্ ছিলেন অত্যন্ত উদারহৃদয়, বন্ধুবৎসল, স্বজনবৎসল ও মাতৃভক্ত। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু দেশের সরকার ও সম্রাট তাঁকে নানা সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তিনি অক্সফোর্ডে পরলোকগমন করেন।

(৭) যোহান্ গেঅর্গ ব্যুল্যর্

যোহান্ গেঅর্গ ব্যুল্যর্ জার্মানির হ্যানোভার প্রদেশে বোর্স্টেল্ নামক গ্রামে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। হ্যানোভারে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি গোটিঙ্গেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষা ও প্রত্নতত্ত্বের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'ডক্টরেট্' উপাধি লাভ করেন। সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক থিওডোর বেন্‌ফির পরামর্শে তিনি প্যারী, লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে গিয়ে সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণ করেন। ঐসব স্থানের

SANSKRIT AND WORLD LITERATURE

সংস্কৃত এবং বিশ্বসাহিত্য

উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪)

১৭৪৬ সালে ২৮ শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের লণ্ডনে উইলিয়াম জোন্সের জন্ম হয়। তাঁর পিতা উইলিয়ম জোন্স (১৬৭৫-১৭৪৯) একজন বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন। উইলিয়াম জোন্স অল্প বয়সে গ্রীক, লাতিন, ফার্সি, আরবি, চীনা প্রভৃতি ভাষায় ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করেন। জোন্সের যখন তিন বছর বয়স তখন তাঁর পিতা মারা যান। তাঁর মা মেরি নিক্স তাঁকে মানুষ করেন। লণ্ডনের হ্যারো স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। তারপর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কলেজে ভর্তি হন এবং ১৭৮৬ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৭৩৩ সালে তিনি এম.এ পাশ করেন। আর্থিক অভাবে জোন্স এরপর সাত বছর বয়সী অ্যালথর্প কে পড়াতে শুরু করেন। পরবর্তী ছয় বছর তিনি শিক্ষক ও অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। এই সময় তিনি "Historie de Nader Chah" (১৭৭০) প্রকাশ করেন। ডেনমার্কের রাজা সপ্তম খ্রিষ্টানের অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। জোন্স মাত্র ২৪ বছর বয়সেই প্রাচ্যবিদ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

১৭৭০ সালে তিনি আইন শিক্ষার জন্য Middle Temple এ যান এবং তিন বছর ধরে আইন অধ্যয়ন করেন। ১৭৭২ সালে ৩০ শে এপ্রিল তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৭৮৩ সালে এপ্রিল মাসে জোন্স Dr. Jpnathan Shipley এর জ্যেষ্ঠ কন্যা Anna Maria কে বিবাহ করেন। ঐ বছরই ২৫ শে সেপ্টম্বর তিনি ভারতে আসেন।

জোন্স একজন মৌলবাদী রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৭৮৪ সালে তিনি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এশিয়াটিক রিসার্চ নামে একটি পত্রিকা শুরু করেন। নদীয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রামলোচন মহাশয়ের কাছে জোন্স বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

পরবর্তী দশ বছরে তিনি ভারতবর্ষে তাঁর কর্মকাণ্ডের জোয়ার সৃষ্টি করলেন। প্রায় প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা, স্থানীয় আইন, সঙ্গীত সাহিত্য, বোটানি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংস্কার মূলক কাজ করেছেন। এছাড়াও ভারতীয় বহু বিখ্যাত

সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ করেন। তাঁকে 'অক্সফোর্ড জোন্স' নামেও ডাকা হয়। ১৭৭৪ সালে ২৭ শে এপ্রিল মাত্র ৪৭ বছর বয়সে কলকাতায় জোন্সের মহাপ্রয়ান হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ পরিচিত। ১৭৮৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি বক্তৃতায় তিনি সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন ভাষার একটি সাধারণ সম্পর্কের কথা বলেন। তবে ভাষা সমূহের এই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি নন, ষোড়শ শতকের অনেক প্রাচ্যবিদই ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার সম্পর্কের কথা বলেছেন। বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেন সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য সকল ভাষার থেকে অনেক বেশী নিখুঁত, এবং সুদৃঢ় পরিকাঠামো তাঁর ভাষায়— " The Sanskrit Language whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect then the Greek, more copious then Latin and more exquisitely refined then either yet bearing to the both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar, then could possibly have been produced by accident, so strong indeed that, no philologer could examine then all three without believing them to have sprung from same common source, which perhaps no longer exists, there is a similar reasons through not quite so fixible for supposing that both the Gothic and the celtik, though blended with a very different idiom had the Sanskrit, and the old Parsian might be added to the same family."

জোন্স এমন কিছু তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যা বর্তমান কালে অলীক মনে হতে পারে। যেমন তিনি মনে করতেন প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মিশরীয় পুরোহিতরা ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে চীনারা মূলত ক্ষত্রিয় জাতের হিন্দু ছিল।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী অনেক, যেমন—

1. A Grammar if the persion Language (1771)
2. A dissertation on the orthography of Asiatic Society word in Roman letter (1786)
3. Persion poem of Hatifi (1788)
4. অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ এর ইংরেজী অনুবাদ (১৭৯০)
5. Dissertation and miscellaneous pieces relating to the history and antiquities, the arts Sciences and literature (1792)
6. Institutes if Hindu law (1796)

এছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংখ্যাও বহু। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর অতল জ্ঞানের পরিচয় এই গুলির মধ্যে দিয়ে গেছেন।

নির্যাস— এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের লেখনী ও সাহিত্যমূলক কৃতি সত্যই বিস্ময়ের। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি যে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আর বলে দিতে হয় না। পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে যে একটা গঠনমূলক সাদৃশ্য আছে তা তাঁর জন্যই সকলের গোচরে আসে। বিশেষতঃ ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বর্তমান ভাষাবিজ্ঞানে তিনি অতি সুপরিচিত। বহু ভাষায় দক্ষতার জন্যই এই অসাধ্য সাধন হয়েছে।

संस्कृत–टीका

उइलियामजोन्स

१७४६ ईशवीयाब्दे २८ सेप्टेम्बर इति मासाङ्के इंलण्डप्रदेशस्य लण्डननगर्याम् उइलियाममहोदयः अजायत। तस्य पिता उइलियमजोन्समहोदयः (१६७५—१७४९) आसीत् प्रख्यातः गणितविदः। जोन्समहोदयस्य त्रिवर्षवयसि एव तस्य पिता अम्रियत। तदा मात्रा मेपिनिक्समहोदयया जोन्समहोदयस्य पालितम् अभवत्। १७६८ ईशवीयाब्दे अक्सफोर्डविश्वविद्यालयस्य महाविद्यालय स्नातकः अभवत्। जोन्समहाशयः अल्पवयसि एव स ग्रिक–ल्यातिन–फार्सि–आरवि–चीना–इत्यादिषु भाषासु निपुणरासीत्। डेनमार्कप्रदेशस्य राज्ञः सप्तमख्रिष्टनस्य अनुरोधेन १७७० ईशवीयाब्दे "Historie de Nader Chah" इति अनुवादमूलकं ग्रन्थमेकं लिखितं जोन्समहोदयेन। चतुर्विंशति एव वयसि स भाषाविद्रूपेण प्रख्यातः अभवत्।

१७७२ ईशवीयाब्दे ३० मे जोन्समहोदयः रय्यालसोसाइटि इत्यस्य सदस्यरूपेण निर्वाचितम् अभवत्। १७८३ ईशवीयाब्दे २५ सेप्टेम्बर इति मासाङ्के सः भारते आगतवान्। ततः १७६४ ईशवीयाब्दे १५ जानुयारी इति मासाङ्के तेन कलिकातायां 'एशियाटिक–सोसाइटि' इति प्रतिष्ठितम्। नदीयाहिन्दुविश्वविद्यालयस्य पण्डितरामलोचनमहाशयात् जोन्समहोदयः वेदादिशास्त्रेषु ज्ञानं अलभत।

परवर्तीषु दशवर्षेषु जोन्समहोदयः शिक्षाव्यवस्थायाः कृते विभिन्नानि

उत्तर : जोन्समहोदयेन विराचतषु ग्रन्थषु ग्रन्थद्वयं यथा—

1. A Grammar if the persion Language (1771)
2. A dissertation on the orthography of Asiatic Society word in Roman letter (1786)

উত্তর। জোন্সমহোদয়েন বিরচিতেষু গ্রন্থেষু গ্রন্থদ্বয়ং যথা—

1. A Grammar if the persion Language (1771)
2. A dissertation on the orthography of Asiatic Society word in Roman letter (1786)

চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯-১৮৩৬)

চার্লস উইলকিন্স ১৭৪৯ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ লেখক ও ওরিয়েন্টালিস্ট এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রথম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৭৮৮ সালে তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ভারতের Caxton হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১৭৭০ সালে উইলকিন্স ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রাকর ও লেখক হয়ে ভারতে আসেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর সাবলীলতার জন্য তিনি খুব সহজেই বাংলা ভাষা শিখে নেন। তারপর তিনি বাংলা ভাষার মুদ্রণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। ভাষার ওপর 'টাইপস্' বইটি প্রকাশ করে তিনি ভারতের ক্যাক্সটন উপাধি লাভ করেন। ১৭৮১ সালে তিনি রাজস্বকমিশনার এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুপারিটেনডেন্টের কাছে ফার্সি ও বাংলা ভাষার অনুবাদক হিসেবে যুক্ত হন। ১৭৮৪ সালে উইলকিন্স পশ্চিমবঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতে সহায়তা করেন।

এরপর উইলকিন্স বারাণসীতে চলে যান। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কালীনাথের কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি মহাভারতের অনুবাদের কাজ শুরু করেন।

ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর ওয়ারেণ হেস্টিংসের কাছ থেকে এইসব কাজের জন্য দৃঢ় সমর্থন লাভ করেন। যদিও তিনি মহাভারতের অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করতে পারেন নি। ১৭৮৫ সালে তাঁর বিখ্যাত কর্ম ভগবদ্গীতা (কৃষ্ণ ও অর্জুনের সংলাপ) বইটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই বইটির জন্য তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁর যুক্তিতে গীতা একেশ্বরবাদী। কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম নয়, সকল ধর্মের সারকথা জানার তাঁর এক অদম্য ইচ্ছা ছিল। তিনি ইসলামিক ধর্মের বিষয়েও অনেক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মোট ১৬ বছর (১৭৭০-১৭৮৬) ভারতে ছিলেন। সেই সময় তিনি বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র মন্দিরে গিয়ে সেই ধর্মের মূলতত্ত্ব জানতে চেষ্টা করতেন। বারাণসীতে থাকাকালীন সময়ে তিনি শিখদের পবিত্র গুরুদুয়ার, গুরুগোবিন্দ সিং জীর জন্মস্থান Patna Sahib Gurudwara তে যান। ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা Sikhs and Their College at Patna বইতে প্রকাশ করেন।

তাঁর অনুদিত গীতা খুব শীঘ্র ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই বইটি তৎকালীন সময় থেকে ইউরোপীয় দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

হেস্টিংসের প্রস্থানের ফলে উইলকিন্স ভারতে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা হারান। ১৭৮৬ সালে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান। সেখানে তিনি এলিজাবেথ কিবল নামে এক ব্রিটিশ রমণীকে বিয়ে করেন। ১৭৮৮ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তার আগে তিনি একবার ব্রিটিশ লাইব্রেরীর পরিচালক হওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। এই সময় তিনি দেবনাগরী লিপির জন্য "Divine Script" ফন্ট তৈরীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮০৮ সালে তাঁর রচিত "Grammar of the Sanskrit Language" বই টি প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ সালে তিনি রাজা চতুর্থ জর্জ কর্তৃক Royal Guelphic Order সম্মানে সম্মানিত হন। ৮৬ বছর বয়সে ১৮৩৬ সালে ১৩ ই মে এই মহামানবের জীবনাবসান ঘটে।

অনুবাদ ও টাইপ ডিজাইনের পাশাপাশি তিনি জন রিচার্ডসনের ফার্সি ও আরবি অভিধান নামে একটি অভিধান গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এছাড়াও তিনি উইলিয়াম জোন্সের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি গুলির একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করেন।

নির্যাস— উইলকিন্স প্রথমে টাইপিস্ট হিসেবে ভারতে আসেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ তাকে ভারতীয় সাহিত্যে পদার্পণ করতে বাধ্য করে। শ্রীমদ্ভগবগীতার ইরেজী অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি গীতার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দেন। ভারতীয় ধর্মের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ টান ছিল। ভারতে থাকাকালীন তিনি বহু ভারতীয় মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি ধর্মস্থানে গিয়ে ধার্মিক জ্ঞান লাভ করতেন। ভারতীয় দর্শন তথা আধ্যাত্মিকতার বিশ্বপ্রচারে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তার জন্য ভারতবাসী তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে।

এইচ. উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০)

১৭৮৬ সালে ২৬ শে সেপ্টেম্বর এইচ-উইলসন ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। সেন্ট থমাস হসপিটালে তিনি ডাক্তারি অধ্যয়ন করেন। ১৮০৮ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্জন হয়ে ভারতে আসেন উইলসন। উইলসন ভারতের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ভাবে আগ্রহী ছিলেন। ১৮১১ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮১৩ সালে কালিদাসের বিখ্যাত গীতিকাব্য 'মেঘদূত' এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঋগ্বেদের ইংরেজী সংস্করণ করেন।

১৮১৯ সালে উইলসন নিজগবেষণাগত তথ্য এবং স্থানীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় প্রথম সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান তৈরী করেন। এই মহান কাজের জন্য তিনি সাহিত্যানুরাগীদের কাছে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হন। উইলসন ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রতি এবং চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিজে যেহেতু একজন ডাক্তার ছিলেন সেহেতু ভারতে এসেও তিনি প্রয়োজনে মানুষের সেবা করতেন এবং কোলকাতা মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল সোসাইটির পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত ভাবে কলেরা কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি নিয়ে লেখালেখি করতেন।

১৮২৭ সালে উইলসন "Sebct Speciment of the theater of the Hindus" পুস্তকটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব, ছয়টি ভারতীয় নাটকের ইংরেজী অনুবাদ এবং তেইশটি নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁর Mackenzie Collection on (1828) প্রাচ্য, বিশেষ করে দক্ষিণভারতীয় পাণ্ডুলিপি এবং কলিন ম্যাকেনজির তৈরী প্রাচীন পুস্তকগুলির বিস্তৃত সংগ্রহের একটি বর্ণনামূলক ক্যাটালগ্। যা বর্তমানে বিটিশ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

উইলসন ভারতে বহুবছর ধরে সরকারি নির্দেশনা কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন এবং কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়নকে অবহিত করেন। স্থানীয় স্কুলে ভারতীয়দের শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ইংরেজী হোক- এবিষয়ে তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন তাই তাঁকে নানা সময় হিংসার শিকার হতে হয়। ১৮৩২ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি নব প্রতিষ্ঠিত বোডেন চেয়ারের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৮৩৬ সালে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতায় চিকিৎসা ও শারীরিক সোসাইটির

সদস্য ছিলেন এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির মূল সদস্য ছিলেন। ১৮৬০ সালের ৮ ই মে এই প্রাচ্যানুরাগীর মহান্ ব্যক্তির মহাপ্রয়ান ঘটে।

উইলসনের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—

(1) Selected speciments of the theatre of te Hindus (Volume1 and 2) 1827

(2) Mackenzie Collection-1828

(3) পাঁচটিভাগে সম্পূর্ণ বিষ্ণুপুরাণ (১৮৪০)

(4) An Introduction of the Grammar of Sanskrit Language for the use of Early students -1841

(5) মেঘদূত বা বার্তাবাহক মেঘ।

(6) ছয়টি ভাগে সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ।

(7) Puransa-An account of their contents and nature.

নির্যাস— H.H Wilson একজন বিশিষ্ট প্রাচ্যানুরাগী এবং সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অবদান সত্যই প্রশংসার দাবী করে। তিনিই প্রথম সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা তাকে ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আগ্রহী করে তোলে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে ভারতীয় বেদ, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্য, নাট্যতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি তাঁর অবদান রেখে গেছেন। তাঁর প্রদর্শিত মার্গ সর্বদা সংস্কৃতপ্রেমীদের দিগদর্শন করাবে।

संस्कृत टीका

एइच्. एइच्. उइलसन

१७८६ ईशवीयाब्दे २६ सेप्टेम्बर इति मासाङ्के उइलसनमहोदयः इंल्यण्डप्रदेशे अजायत। सेन्टथमासचिकित्सालये स चिकित्साविषये ज्ञानं लब्धवान्। १८८० ईशवीयाब्दे च उइलसनमहोदयः भारते आगच्छत्। प्राचीनभारतीय-भाषायां तथा साहित्ये तस्यासीत् गभीरानुरागः। १८११ ईशवीयाब्दे सः 'एशियाटिकसोसाइटि' इत्यस्य सचिवरूपेण नियुक्तम् अभवत्। १८१३ ईशवीयाब्दे तेन कालिदासस्य विख्यातगीतिकाव्यस्य 'मेघदूतम्'

কেন বা লিখিতম্?

উত্তর : ১৮২৭ ইশবীয়াব্দে পুস্তকমিদং Selected speciments of the theatre of the Hindus ইতি উইলসনমহোদয়েন লিখিতম্।

উত্তর। ১৮২৭ ঈশবীয়াব্দে পুস্তকমিদং Selected speciments of the theatre of the Hindus ইতি উইলসনমহোদয়েন লিখিতম্।

৫. উইলসনমহোদয়স্য মহাপ্রয়ানং কদা অভবৎ?

৫. উইলসনমহোদয়স্য মহাপ্রয়ানং কদা অভবৎ?

উত্তর : ১৮৬০ ইশবীয়াব্দে ৮ মে ইতি মাসাঙ্কে উইলসনমহোদয়স্য মহাপ্রয়ান অভবৎ।

উত্তর। ১৮৬০ ঈশবীয়াব্দে ৮ মে ইতি মাসাঙ্কে উইলসনমহোদয়স্য মহাপ্রয়ানম্ অভবৎ।

৬. উইলসনমহোদয়স্য দ্বয়ো গ্রন্থয়োঃ নাম লিখ্যতাম্।

৬। উইলসনমহোদয়স্য দ্বয়ো গ্রন্থয়োঃ নাম লিখ্যতাম্।

উত্তর : (1) Mackenzie Collection-1828 (2)`An Introduction of the Grammar of Sanskrit Language for the use of Early students

উঃ (1) Mackenzie Collection-1828 (2)`An Introduction of the Grammar of Sanskrit Language for the use of Early students

ম্যাক্সমুলার Max Muller
(১৮২৩-১৯০০)

ফ্রেডরিচ ম্যাক্সমুলার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ই ডিসেম্বর জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন উইলহেলম মুলার (Wilhelm Mular) এবং তাঁর মা ছিলেন আদেলহেড মুলার (Adelheid Mullar)। তাঁর পরিবার ছিল জার্মানির দেসাও (Dessau) প্রদেশের অন্যতম সংস্কৃতিপ্রবণ পরিবার। তাঁর পিতা গীতিকার ও কবি ছিলেন। মাতাও ছিলেন প্রখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারের প্রধানমন্ত্রীর কন্যা। ম্যাক্সমুলারের জন্ম জার্মানিতে হলেও তাঁর শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবন ইংলণ্ডে। তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

ম্যাক্সমুলার মাত্র ছয় বছর বয়সে দেসাওতে জিমনসিয়াম (Gymnasium) নামে একটি ব্যাকরণ (Grammar) শিক্ষার স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দাদুর মৃত্যুর পর তিনি শিক্ষা গ্রহণের জন্য লিপজিগা (Leipzig) তে যান। সেখানে নিকোলাই (Nicolai)

স্কুল এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি সঙ্গীত ও ধ্রুপদী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এখানে শিক্ষা গ্রহণের সময় তিনি ফেলিক্স মেন্ডেলসনের সাথে দেখা করতেন।

স্কলারশিপের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনের পরে লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে প্রথমে তিনি গণিত, আধুনিকভাষা এবং বিজ্ঞান শিখেছেন। তারপর সঙ্গীত ও কবিতার আগ্রহ তাঁর কিছুটা কমে আসে এবং ভাষাবিদ্যা অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। ১৮৪১-৪৩ পর্যন্ত তিনি নীতিশাস্ত্রের উপর গবেষণা করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গ্রিক, ল্যাটিন, আরবি, ফার্সি এবং সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাষার অধ্যাপক হিসাবে। পরের বছর থমাস গফফোর্ভের পরামর্শে তাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চের সদস্য পদে নিয়োগ করা হয়। ১৮৫৪ সালে 'অল সোলস কলেজে'র আজীবন ফেলোশিপ পদে নির্বাচিত হন। ১৮৬০ সালে সংস্কৃতের বোডেন প্রফেসর পদের নির্বাচনে তিনি মনিয়ার উইলিয়ামস এর কাছে পরাজিত হন। ১৮৬৮ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দী অধ্যাপক হয়ে ওঠেন। মৃতুর পূর্ব দিন পর্যন্ত সেই সম্মান তাঁর অক্ষুন্ন ছিল। ১৮৭৫ সালে তিনি যদিও এই পদের সক্রিয় দায়িত্ব থেকে সরে আসেন।

১৮৪৪ সালে অক্সফোর্ডে কর্মজীবন শুরু করার পূর্বে তিনি বার্লিনে ফ্রেড্রিক শেলিংয়ের সাথে অধ্যয়ন করতেন। শেলিংয়ের অনুপ্রেরণায় তিনি উপনিষদের অনুবাদ শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় (IE) ভাষার প্রখ্যাত পণ্ডিত ফ্রাঞ্জ বোপের অধীনে সংস্কৃত গবেষণা কার্যে অব্যাহত থাকেন। এইসময় তিনি 'হিতোপদেশ' গল্প গ্রন্থকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৮৪৫ সালে ইউলিন বার্ণ উফের অধীনে সংস্কৃত অধ্যয়ন করার জন্য ম্যাক্স মুলার প্যারিসে গমন করেন। বার্ণ উফ ইংলণ্ডে পাওয়া পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ প্রকাশ করার জন্য জন্য মুলারকে উৎসাহিত করেন। ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত অধ্যয়ন করার জন্য তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগ্রহশালা ইংলণ্ডে চলে যান। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সংস্কৃতি প্রধান ভাষ্যকার হন। তাঁর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবি সংস্কৃতির মেলবন্ধন সাধিত হয়েছিল। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের সাথে তাঁর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল।

মুলার অসাধারণ দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁর গবেষণা পত্রে এরকম বলা হয়েছে অনুমান করা হয়—ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি, ইউরোপীয় শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির পূর্বকালের বা অনেকটাই সম্পর্কযুক্ত। শুধু তাই নয় বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত, IE ভাষার প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়। মুলার সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক সংস্কৃতপণ্ডিতদের মধ্যে তিনি অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৌত্তলিক

ইউরোপীয় ধর্মগুলির উন্নয়নের জন্য এবং সাধারণভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য বৈদিক সংস্কৃতির প্রাচীনতম নথিগুলি অধ্যয়ন করা উচিত। এই সময় মুলার প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রসমূহ এবং ঋগ্বেদ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেছিলেন ও মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় তিনি ভারতের বিবেক এবং বেদান্ত দর্শনের জ্ঞান ভাণ্ডার বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর গুরুদেব যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের কর্ম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই দুই জন মানুষের দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং তাঁদের সম্পর্কে তিনি কিছু পুস্তকও রচনা করেন।

মুলারের সংস্কৃত প্রেম সর্বজনবিদিত। বৈদিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর অত্যাসক্তি ছিল। ১৮৪২ -১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঋগ্বেদের সংস্করণের উপর কাজ করেন। তিনি ঋগ্বেদের দেবতাগুলিকে প্রকৃতির সক্রিয় কাহিনী হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে 'দেবতা' শব্দগুলি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করার জন্য নির্মিত ও ব্যক্তিত্বগুলি সম্পূর্ণভাবে কল্পিত।

মুলার তাঁর কর্মজীবনে বহুবার হিন্দুধর্মের সংস্কারের সাথে খ্রীষ্টধর্মের তুলনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এরকম— "যদি এমন একটি জিনিস থাকে যা ধর্মীয় তুলনামূলক আলোচনার আলোকে হালকা আলোতে অবস্থান করে, তবে এটিই অনিবার্য্য ক্ষয় যা প্রতিটি ধর্মে উন্মোচিত হয়।.....যখনই আমরা একটি ধর্মকে তার প্রথম সূচনাতে ফিরিয়ে আনতে পারি সেটাই ধর্মের জয়।" তিনি রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের কাজের সাথে অনেকটাই একমত ছিলেন। বিভিন্ন কুসংস্কার ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা এই আধুনিক হিন্দুধর্মের পূজারী ছিলেন তিনি। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি প্রণিধান যোগ্য—

"The translation of the veda will here after tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion and to show them what the root is. I feel sure is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years."

তিনি তাঁর মহান কর্মজীবনে ভারতের সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে মহান্ করেছেন। বিভিন্ন বক্তৃতায় সেই বিষয়টি বারবার ধরা পড়েছে। ১৮৬৮ সালে তিনি ভারতের নবনির্বাচিত সেক্রেটারিকে লিখেছেন— "ভারত একবার জয়লাভ করেছে, কিন্তু ভারত আবার জয়ী হবে এবং দ্বিতীয় বিজয়টি হবে শিক্ষার দ্বারা"।

১৮৮৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বক্তৃতায় তিনি ভারতকে এবং ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে গৌরবের শিখরে আসীন করেছেন— 'যদি আমি সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে আমি সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধির উৎস পরমদেশ ভারতকে

দেখতে পাই'।

সম্মান— তাঁর স্মরণীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, পেয়েছেন বহু পদ। যেমন—

(১) ১৮৬৯ সালে মুলার ফরাসি অ্যাকাডেমী দেস শিলালিপি এবং বেলেস লেট্রেসের বিদেশী সংবাদদাতা হিসাবে নিযুক্ত হন।

(২) ১৮৭৪ সালের জুন মাসে মুলারকে পোর-লে-মেরাট (Civil Class) প্রদান করা হয়।

(৩) ১৮৭৫ সালে তাঁকে বিজ্ঞান ও শিল্পের জন্য Bavarian ম্যক্সিমিলিয়ান অর্ডার প্রদান করা হয়।

(৪) ১৮৯৬ সালে মুলার মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন।

(৫) প্রুশিয়া ও ইতালি সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধি প্রদান।

প্রকাশনা— মুলারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগুলির ১৮ টি Volium কালেক্টেড ওয়ার্কস (collected works) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে সংস্কৃত বিষয়ক রচনা ১১ টি। সেগুলি হল—

১) ঋগ্বেদ (সায়ণভাষ্য সহকারে) ১৮৪৯ -৭৩ (৬ খণ্ডে)।

২) জার্মান ভাষায় হিতোপদেশেষর অনুবাদ -১৮৪৪

৩) জার্মান ভাষায় মেঘদূতের অনুবাদ—১৮৪৭

৪) ঋক্-প্রাতিশাখ্যের জার্মান অনুবাদ—১৮৫৯-৬৯

৫) উপনিষদগুলির ইংরেজী অনুবাদ—১৮৭৯

৬) প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—১৮৫৯ (A History of Ancient Sanskrit Leterature)

৭) এ সংস্কৃত গ্রামার (A Sanskrit Grammar)

৮) India-what can it teach us?—১৮৮৩ (ভারত আমাদের কি শিক্ষা দিতে পারে?)

৯) আপস্তম্ব সূত্রের ইংরেজী অনুবাদ—১৮৯৩

১০) The six system of Hind Philosophy—১৮৯০ (হিন্দু দর্শনের ছয়টি নিয়ম)

১১) Three lectures on Vedanta Philosophy—১৮৯৪ (বেদান্ত দর্শনেপ উপর তিনটি আলোচনা)

নির্যাস— ম্যাক্সমুলার ছিলেন বিখ্যাত ভারতবিশারদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক জার্মান পণ্ডিত ও অনুবাদক। প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বেদের প্রায় প্রতিটি শাখার উপর নিজের মূল্যবান

মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। জীবনের শেষভাগে বৈদিক বাঙ্ময়ের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে তাঁকে ভারতীয়েরা 'মোক্ষমূলের' পদবীতে ভূষিত করেছিলেন। সায়ণভাষ্য সহ ঋগ্বেদ সম্পাদনা তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। এছাড়াও 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। বৈদিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি পাশ্চাত্যের মনোভাব জানতে হলে ম্যাক্সমূলার কৃত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন বলে গণ্য হবে।

ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে— ' India -what can it teach us ' নামক বইটিতে। তবে ভারপ্রেমিক ও ক্ষণজন্মা মনীষী তাঁর সুগভীর ভারতপ্রেমের অপরাধে কখনো ভারতবর্ষে পদার্পন করতে পারেননি। ভারতবর্ষে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুসৃত শাসন পদ্ধতির সমালোচনার শাস্তি ছিল এটি, মনে করা হয়। ' India -what can it teach us ' বইয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এবং তার ভারতবর্ষ সম্পর্কে মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি হিন্দুদের সততা তুলে ধরেছিলেন। তৃতীয়তে আছে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ, পঞ্চমে বেদ, সপ্তমে বেদ এবং বেদান্ত স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বৌদ্ধধর্মের কথাও আছে এই বইয়ে। এই বইয়েরই এক জায়গায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বিপ্লবের কথা আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ধর্ম হিসাবে হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দেব-দেবীর উপর বিশ্বাসের পাশাপাশি খাঁটি একেশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণাও বিদ্যমান রয়েছে। হিন্দুদের দেবতাতত্ত্ব নিয়ে তিনি বলেছেন— "আসলে বেদের যে দেবতাতত্ত্ব তাকে বহু ঈশ্বরবাদ হিসাবে আখ্যায়িত না করে বরং একে পরম সত্ত্বায় বহু দেবতার মিলনস্থল বলাই উত্তম"। এইরকম একজন মহান মানব যিনি ব্রিটিশ নাগরিক হলেও মনে প্রাণে ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেমিক, জর্জিনা এডিলেইড পতি ম্যাক্সমুলার ১৯০০ সালের ২৪ শে অক্টোবর অক্সফোর্ড নগরে দেহত্যাগ করেন।

संस्कृत टीका

म्याक्समुलारः

पाश्चात्येषु पण्डितेषु संस्कृतसाहित्ये अविस्मरणीय नाम भवति म्याक्समुलारः। १८२३ ख्रीष्टाब्दस्य डिसेम्बरमासस्य षष्ठदिवसे स जार्माणि

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৮৭৬-১৯৬১)

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।।

যে কাব্যপুরুষ কীর্তিধ্বজা উড্ডীন করে হরিদাস ভট্টাচার্য থেকে হয়েছেন সিদ্ধান্তবাগীশ, যিনি সারাজীবন সারস্বত সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, আধুনিক কালের তমসাপূর্ণ সংস্কৃতকাব্যাঙ্গন যাঁর লেখনী দ্যুতিতে হয়েছে উদ্ভাসিত, তিনি রত্নগর্ভা বঙ্গভূমির গর্ভে ১৮৭৬ সালের ২২ শে অক্টোবর (বাংলা ১২৮৩ সালের ৭ ই কার্ত্তিক) রবিবার অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার 'কোটালিপাড়া' পরগণার ঊনশিয়া গ্রমের কাশ্যপ পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বংশেই জাত হয়েছিলেন তাঁর পূর্বসূরী প্রমোদন পুরুন্দরাচার্য ও অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মধুসূদন সরস্বতী। কোটালিপাড়ার সংস্কৃতচর্চ্চা সুপ্রাচীন। এই মধুসূদন সরস্বতীকে সম্রাট আকবর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। ষোড়শ শতকে এই সংস্কৃতজ্ঞ মনিষীর অবির্ভাবে বঙ্গাদেশে বেদান্ত চর্চার ধারা পরিপুষ্ট হয়েছিল। মধুসূদনের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে। সেটি হল—

'মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি মধুসূদন সরস্বতী।।'

বলাই বাহুল্য এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে উত্তরাধিকার সূত্রেই হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নৈসর্গিকী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এই নৈসর্গিক প্রতিভা কাব্যরচনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী—

নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভির্যোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ।। (কা.দ.১।১০৩)

তাঁর জীবনের নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, সময়ানুবর্ত্তিতা সবই তিনি প্রথম পেয়েছিলেন পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার, মাতা বিধুমুখী দেবী ও পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির কাছে। পিতামহের কাছেই মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতে খড়ি হয়। তরপর পাঁচবছর গ্রামের পাঠশালায় বাংলা শিক্ষাগ্রহণ করেন। মাত্র এগার বছর বয়সেই পিতামহ কাশীচন্দ্রের কাছে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তারপর কোটালিপাড়ার পশ্চিমপাড়াতে চতুষ্টয় বৃত্তির নামপ্রকরণ, অখ্যাতবৃত্তি ও কৃদ্‌বৃত্তির দ্বিতীয় প্রকরণ পর্যন্ত আয়ত্ত করেন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণের কাছে। কারক, সমাস, তদ্ধিত, কৃদ্‌বৃত্তির বাকী অংশ এবং সম্পূর্ণ পরিশিষ্ট অধ্যয়ন করেন পুনরায় পিতামহের কাছে। নিজ গ্রামের আর্য শিক্ষাসমিতিতে কলাপ ব্যকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে শব্দাচার্য্য উপাধি, বৃত্তি

ও পুরস্কার লাভ করেন। ১৩০৫ সনে ঢাকার সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে সাত টাকা ও একটি শীতবস্ত্র উপহার পান। এই সারস্বত সমাজই তাঁকে **'সিদ্ধান্তবাগীশ'** উপাধিতে ভূষিত করে। আরও অনেক উপাধি ও সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। যেমন—

ব্যাকরণতীর্থ— (সংস্কৃত কলেজ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে)
পুরাণশাস্ত্রী— (ঢাকা সারস্বত সমাজ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে)
সাংখ্যরত্ন— (ঢাকা সারস্বত সমাজ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দে)
স্মৃতিতীর্থ— (১৩১১ বঙ্গাব্দে)
বিদ্যাবাগীশ —(পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ)
মহামহোপাধ্যায় —(ব্রিটিশ সরকার, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)
পদ্মভূষণ — (ভারত সরকার, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কিশোর বয়সেই তিনি বিবিধ কাব্য প্রণয়ন করেন। মাত্র পনের বছর বয়সেই 'কংসবধ' নাটক, 'শংকসম্ভবম্' কাব্য, আঠার বছর বয়সে 'জানকীবিক্রম' নাটক, কুড়ি বছর বয়সে 'বিয়োগবৈভবম্' রচনা করেন। কাব্যরচনার সাথে হরিদাস জীনকপুর নরেশের টোলে প্রাধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর নাটকগুলিতে হিন্দুত্বের অভিমান ও রাষ্ট্রের পুনরুত্থান ভাব প্রবল ভাবে লক্ষণীয়। তাঁর রচিত নাটকগুলি রঙ্গামঞ্চে বহুবার সফলভাবে অভিনীত হয়েছে। তাঁর কাব্যের বিষয় যুগোপযোগী ওজোগুণ সমৃদ্ধ এবং সুখবোধ্য। তিনি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এক প্রতিভাশালী কবি ও বাগ্মীরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত কাব্য, সম্পাদিত টীকা প্রভৃতির তালিকা সুদীর্ঘ। যেমন—

মহাকাব্য—রুক্মিণীহরণম্।
খণ্ডকাব্য —বিয়োগবৈভবম্, শঙ্করসম্ভবম্, বিদ্যাবিত্তবিবাদঃ।
নাটক— কংসবধম্, জানকীবিক্রমম্, বঙ্গীয়প্রতাপম্, মেবারপ্রতাপম্, শিবাজিচরিতম্, বিরাজসরোজিনী।
উপন্যাস— সরলা (পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়কে আধার করে)
শাস্ত্র— কাব্যকৌমুদী, স্মৃতিচিন্তামণি, বৈদিকবিবাদমীমাংসা।
টীকাগ্রন্থ—উত্তররামচরিতম্— ভবভূতি।
মহাবীরচরিতম্— ভবভূতি।
মালতীমাধবম্— ভবভূতি।
মেঘদূতম্— কালিদাস।
কুমারসম্ভবম্— কালিদাস।
রঘুবংশম্— কালিদাস।

সংস্কৃত

মালবিকাগ্নিমিত্রম্—	কালিদাস।
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—	কালিদাস।
দশকুমারচরিতম্—	দণ্ডী।
কাদম্বরী—	বাণভট্ট।
মৃচ্ছকটিকম্—	শূদ্রক।
শিশুপালবধম্—	মাঘ।
মুদ্রারাক্ষসম্—	বিশাখদত্তঃ।
নৈষধচরিতম্—	শ্রীহর্ষ।
সাহিত্যদর্পণঃ—	বিশ্বনাথ কবিরাজ।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর সারস্বত জীবনে বহু কাব্য রচনা করেছেন, বহু গ্রন্থের টীকা রচনা করেছেন। অনেক বাংলা ভাষায় গ্রন্থও রচনা করেছেন। কিন্তু মহাভারতের উপর টীকা গ্রন্থ 'ভারতকৌমুদী' তাঁকে সর্বভারতীয় খ্যাতি প্রদান করেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এতবড় একক কীর্তি আর কারো নেই। দীর্ঘ একুশ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, সাধনায় তিনি মহাভারত সম্পাদনা ব্যাখ্যান ও প্রকাশ করেছেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সারস্বত সাধনা সকলকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে। ৮৫ বৎসরের জীবনে তিনি যে কাব্যকর্ম করে গেছেন, তা পাঠেই সহস্রবৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবে। এই অক্ষয়তকীর্তি জ্ঞানতপস্বী কর্মযোগী প্রাণপুরুষ হরিদাস অক্ষয়লোকের পূণ্যাঙ্গনে অবতরণ করেন ১৯৬১ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর (বাংলা ৯ ই পৌষ—১৩৬৮)।

তাঁর রচনাবলীর কিছু প্রকাশিত, কিছু অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থকে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

রুক্মিণীহরণম্—

'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা, তুমি
আমারি'।

ষোড়শ সর্গে খণ্ডিত মহাকাব্য 'রুক্মিণীহরণম্' বিষয়ে উপযুক্ত রবীন্দ্রগীতিটিই যেন হরিদাসের হৃদয় বীণায় ঝংকৃত হচ্ছে। ১৯১০ সালে এই গ্রন্থটি রচিত হলেও তা ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মহাভারতে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণএর বৃত্তান্ত এই কাব্যের উপজীব্য।

মহাভারতে প্রাপ্ত বিষয়কে হরিদাস তাঁর মহাকাব্যে স্বকীয় প্রতিভাবলে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। আলোচ্য মহাকাব্যের প্রথম সর্গে রুক্মিণীর জন্মবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় সর্গে বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণীর বিদ্যাগ্রহণ, তৃতীয় সর্গে....., চতুর্থ সর্গে নারদ কর্তৃক বানপ্রস্থাভিলাষী বিদর্ভরাজ

ভীষ্মকের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহের প্রস্তাব, পঞ্চম সর্গে ....., ষষ্ঠ সর্গে রুক্মিণী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেমপত্র প্রেরণ, সপ্তম সর্গে ..... , অষ্টম সর্গে শ্রীকৃষ্ণ ও কঞ্চুকীর সংলাপ, নবম সর্গে বিদর্ভের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের যাত্রা, দশম সর্গে....., একাদশ সর্গে শৃঙ্গার বর্ণনা, দ্বাদশ সর্গে শিশুপালের আগমন, ত্রয়োদশ সর্গে রুক্মিণী হরণ, চতুর্দশ সর্গে....., পঞ্চদশ সর্গে রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীর পরাজয়, পরিশেষে ষোড়শ সর্গে দ্বারকায় রাক্ষবিবাহে আবদ্ধ যুগলের (শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর) অভ্যর্থনা বর্ণিত হয়েছে।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র হলেন রুক্মী এবং কন্যা রুক্মিণী। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী পরস্পর প্রণয়পাশে আবদ্ধ। কিন্তু রুক্মিণী ভ্রাতা রুক্মী জরাসন্ধের পরামর্শ অনুসারে শিশুপালের সঙ্গে স্বীয় ভগিনীর বিবাহ স্থির করেন। এই বিষয়টি জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ পরিকল্পনা পূর্বক দন্তবক্র, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতিকে পরাজিত করে রুক্মিণীকে হরণ করেন ও তাঁর পাণিগ্রহণ করেন।

'সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈক নায়কঃ শূরঃ'

ইত্যাদি আলংকারিক নিয়মের বাহুডোরে আবদ্ধ মহাকাব্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য। 'রুক্মিণীহরণম্' মহাকাব্যের কোথাও আলংকারিক রীতির উল্লঙ্ঘন ঘটেনি। বৃহৎত্রয়ীর রচয়িতা ভারবি, মাঘ ও শ্রীহর্ষের কাব্যের ন্যায় হরিদাসের কাব্যেও ছন্দ, রীতি, অর্থগৌরব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির রাজকীয় সমাবেশ ঘটেছে। রাজা ভীষ্মক, রুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণ— শিশুপালের যুদ্ধ প্রভৃতি বর্ণনায় তিনি সার্থক। মহাভারতাশ্রিত মহাকাব্য হলেও তাঁর কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। অর্থান্তরন্যাসের প্রয়োগ ও মধুরা সূক্তি তাঁকে অন্যান্যদের থেকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কয়েকটি সুন্দর উক্তি হল—

(ক) স্বভাবরম্যো হি শিশুস্বভাবঃ। (খ) নিজোন্নতিং সাধু সুধীর্জহাতিন। (গ) অসাবধানস্য সুখেঽপি দুঃখিতা। (ঘ) বহুবিঘ্না হি সতাং সতী ক্রিয়া। (ঙ) পরিভুক্তসয় কুতো বুভূক্ষতা। (চ) গুণো নাপেক্ষতে বয়ঃ। (ছ) ন হি লঙ্ঘয়তে ধীমান্ পূজ্যং পূজিতসদ্‌গুণঃ।

এইরূপ শত শত সূক্তিরত্নের প্রভায় আলোকিত এই মহাকাব্য। এই মহাকাব্যে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের কবিত্ব প্রতিভা, নৈসর্গিক প্রতিভা, নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা, পাণ্ডিত্য সবকিছুর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সংস্কৃতসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম এই মহাকাব্য।

বঙ্গীয়প্রতাপম্—

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রচিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম 'বঙ্গীয়প্রতাপম্'। অধুনা বাংলা দেশের যশোর নামক প্রসিদ্ধ স্থানের স্বাধীনচেতা রাজা প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক বীরত্বব্যঞ্জক গাথা এই নাটকের উপজীব্য। গ্রন্থটি ১৯১৮ সালে লিখিত হয় এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যশোরের ইতিহাস সম্পর্কে লেখক সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। লেখক বলেছেন— 'ময়া তু সম্ভবতি সত্যাশ্রয়েন মিথ্যাশ্রয়ণমন্যায্যমিতি.....

ইতিহাসমনুসরতৈব নাটকমিদং নিরমায়ি'। এই নাটকটি বহুবার কোলকাতায়, কবির জন্মস্থান ঊনাশিয়াগ্রামে, আসামে, গৌরীপুরে সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও এই নাটক অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

গ্রন্থপরিচয়— সম্পূর্ণ নাটকটি আট অঙ্কে লেখা। বীররস ও শৃঙ্গাররস অঙ্গীরস রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। রৌদ্র, হাস্য প্রভৃতি রস অঙ্গারূপে প্রযুক্ত। সুপ্রসিদ্ধ কথাবস্তুকে সুন্দর ভাবে কবি গুম্ফন করেছেন। নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত উত্তম প্রকৃতির। নান্দী, প্রস্তাবনা, অর্থপ্রকৃতি প্রভৃতি নাট্যলক্ষণের যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে। এই নাটকে নায়িকা, বিদুষক, বিট, পীটমর্দ প্রভৃতি চরিত্র অনুপস্থিত। নাটকের নান্দীতে মহাদেবকে আরাধনা করেছেন। সাহিত্যদর্পণানুসারে নাটকের প্রস্তাবনাটি উদ্‌ঘাত্যক শ্রেণীর। বিশ্বনাথ উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনার লক্ষণে বলেছেন—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে।।

আলোচ্য নাটকের প্রস্তাবনায় এই লক্ষণ সঙ্গতি ঘটেছে। সূত্রধার কর্তৃক উচ্চারিত সম্মানার্থে 'মান' শব্দ, পুরোহিত সুপ্রভদেব 'মানসিংগ' অর্থে গ্রহণ করেছেন। নাটকটির প্রথমাঙ্কে অর্থোপক্ষেপক, চতুর্থ অঙ্গো বিষকম্ভকের প্রয়োগ আছে। অঙ্কানুসারে নাটকটির বিষয়বস্তু হল—

অঙ্কের নাম	বিষয়বস্তু
সহায়লাভ (প্রথমাঙ্ক)—	বঙ্গীয়যুবা শঙ্করচক্রবর্ত্তী যশোররাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্যের সাথে মিলিত হয়ে দেশ থেকে মুঘলদের বিতাড়নের পন করেন।
বিহঙ্গানিপাত (দ্বিতীয়াঙ্ক)—	সাধারণ, সরল, অলস ভক্তিভাব যুক্ত বিক্রমাদিত্যের চরিত্র, তার ভাইপো বসন্তরায়ের কুটিলতা এবং তাদের প্রতাপাদিত্যের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা বর্ণিত।
কল্যাণীপরিত্রাণ (তৃতীয়াঙ্ক)—	শঙ্করের সুন্দরী পত্নী কল্যানীকে মোগলদের হাত থেকে উন্মোচনের কাহিনী বর্ণিত।
রাজ্যলাভ (চতুর্থাঙ্ক)—	প্রতাপাদিত্য যশোরের অধীশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত হলেন। মোগল সম্রাট আকবরও তাঁকে স্বীকার করলেন।
বঙ্গেশবিজয় (পঞ্চমাঙ্ক)—	প্রতাপাদিত্যের বঙ্গাদেশ বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত।
রাজ্যাভিষেক (ষষ্ঠাঙ্ক)—	প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক। ধূমঘাট নামে নবরাজধানীর প্রজারা মিলিত হন রাজার রাজ্যাভিষেক দেখতে।
দুর্জননিধন (সপ্তমাঙ্ক)—	মোগল পক্ষ অবলম্বনকারী মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহের সাথে প্রতাপপুত্র উদয়াদিত্যের যুদ্ধ, যুদ্ধে উদয় কর্তৃক

দুর্জনের নিধন বর্ণিত।

প্রতাপবিজয় (অষ্টমাঙ্ক)— সহসা মুগলবাহিনীকে আক্রমণ করে বিজয় প্রাপ্ত হয়ে প্রতাপাদিত্য ভরতবাক্য উচ্চরণ করেছেন।

নাটকের নায়ক প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ সর্বত্র দৃশ্যমান। স্বাধীনচেতা, মোগল শাসক আকবরের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ জয়ী বীর। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপের পরাজয় ও বন্দীদশার চিত্র কবি উপস্থাপন করেন নি। প্রতাপাদিত্যের জয়ধ্বজাই কেবল উড্ডীন করেছেন লেখক।

নাটকটি মূলত বীর রসাশ্রিত কিন্তু অন্যান্য রসের প্রবাহেও আমাদেরকে প্লাবিত হতে হয়। শঙ্করের অনুপমা স্ত্রী কল্যানীর অঙ্গসৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাঁর শৃঙ্গার রসপ্রয়োগ নৈপুণ্য ভাসিত হয়। যথা—

বামেন কেশমবধৃত্য করেণ পশ্চাৎ
দক্ষেণ কঙ্কতিকয়া বিজটীকরোতি।
আস্ফালিতং কুচযুগং ঘনপীনতুঙ্গাং
যূনো যুযুৎসব ইবেৎ সহোরসাস্যাঃ।।

শৃঙ্গার রসের মতই হাস্যরস প্রয়োগেও তিনি নিপুন ছিলেন। হাস্যরসের সাথে আধুনিকতার মিশ্রণটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। যেমন—

প্রথম বরাহুতঃ। কিমুচ্যতে? তাম্রকূটং হি নাম সর্বভূতে বিরাজমানো মহাবিষ্ণুঃ।

কেশব। (বিহস্য) কধং বি অ?

প্রথম বরাহুতঃ । কিং ন পশ্যসি? নারিণাং গুড়িকা বিখণ্ডিতদলং দোক্তাচ সক্তা পৃথক্ নস্যং ভুরি মনীষিণাঞ্চ চুরটং চঞ্চদ্বিলাসাত্মনাম্। হুক্কা—গুড়্গুড়িকালবলাবিলসনৈঃ শেষান্ সমালম্বতে চক্রং দর্শয়তে চ্যুতং বিতনুতে মুক্তিং প্রদত্তে পরম্।

আলোচ্য নাটকে লেখক বঙ্গাবাসীদের চরিত্র প্রস্ফুটিত করেছেন। বঙ্গাবাসীদের বাগ্মীতা কর্মকুশলতা, শাস্ত্রনিপুনতা সমস্ত কিছুই বিদ্যমান। কিন্তু আত্মশক্তির হীনতায় তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। আকবরের সংলাপের মাধ্যমে কবি সেই কথাকেই তুলে ধরেছেন—

বাগ্মী চ কর্মকুশলশ্চ মহাসুধীশ্চ শূরশ্চ শাস্ত্রনিপুণশ্চ সুলেখকশ্চ।
কিন্ত্বেকতাবিরহিতো বিফলাত্মশক্তিঃ বহ্নিস্ফুলিঙ্গা ইব বঙ্গাজনো ন গণ্যঃ।

আলোচ্য নাটকটি অধ্যয়নে বা অভিনয় দর্শনে তৎকালীন দিনের সামাজিক চিত্র, ঐতিহাসিক কাহিনী, বাঙালীর চরিত্র প্রভৃতি জানতে পারি। অতএব হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রচিত 'বঙ্গীয়প্রতাপম্' বাঙালীর গর্ব।

মিবারপ্রতাপম্—

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (১৮৯৪-১৯৯১)

কিয়ন্তি রত্নানি লসন্তি সিন্ধোরন্তর্জলে লোকদৃগন্তরালে।
কিয়ন্তি পুষ্পাণি বিতীর্য্য গন্ধং রহো বিনশ্যন্তি বনস্থলীষু॥

উপর্যুক্ত সূক্তিকে সার্থক করেছিলেন যিনি তিনি হলেন সংস্কৃতসাহিত্য জগতের এক অবিস্মৃত নাম শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। ইনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ভট্টশালী নামক স্থানে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ লেখক কবি পঞ্চানন তর্করত্ন। শ্রীজীব বাল্যকালে সকলের মতই গ্রামে পরম্পরাগত শিক্ষালাভ করেন। তারপর কাশীতে এসে রাখালদাসের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধিগত করেন। তিনি কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়তীর্থ ছিলেন। অধ্যয়ন পরিসমাপ্তির পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যাপনা করেন, অবসর গ্রহণের পর তিনি ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি অধ্যাপনার সাথে সাথে বহু গ্রন্থ বিরচনা করেছেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কর্মের জন্য বহু উপাধি ও অজস্র পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। যেমন—

ডি. লিট্—	কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
মহামহিমোপাধ্যায়—	প্রয়াগবিদ্বৎ সঙ্গোষ্ঠী
ব্যাকরণশিরোমণি—	নবদ্বীপধাম
মহাকবি—	হাওড়া পণ্ডিত সঙ্গোষ্ঠী
দেশিকোত্তম—	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
সংস্কৃতভারতী—	উত্তর প্রদেশ সংস্কৃত আকাদেমী
মহামহোপাধ্যায়—	সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারে সম্মানিত হন।

কালিদাসের ন্যায় শ্রীজীবও বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁকে ঊনবিংশ শতকের কালিদাস নামে ভূষিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর দীর্ঘ সারস্বত জীবনে তিনি বহু কাব্যরত্নরূপ অলংকারে অলংকৃত করেছেন সংস্কৃতসাহিত্যতনুকে। সংস্কৃতসাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর লেখনী বিচরণ করেনি। প্রবন্ধ, রম্যরচনা, প্রশস্তিগাথা, লোকগীতি, অনুবাদকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, প্রকরণ, প্রহসন, ভান, ব্যায়োগ প্রভৃতি বিষয় তাঁর লেখনীজালে ধরা পড়েছে। ১৯২৬ সালে কবির প্রথম কাব্যকীর্তি প্রকাশিত হয়, আর ১৯৮৫ সালে অন্তিম রচনা প্রকাশিত হয়। কবির ষাট বৎসরের রচনাতে যে কাব্যগুলি উপহার রূপে পেয়েছি সেগুলি হল—

শ্রব্যকাব্য

মহাকাব্য — পাণ্ডববিক্রমম্

চিত্রকাব্য— সারস্বতশতকম্

গীতিকাব্য— ঋতুচক্রচঙ্ক্রমণম্

দৃশ্যকাব্য

নাটক— ১. মহাকবিকালিদাসম্, ২. সাম্যসাগরকল্লোলম্, ৩. শ্রীশঙ্করাচার্যবৈভবম্, ৪. নাগনিস্তারম্, ৫. স্বাতন্ত্র্যসন্ধিক্ষণম্, ৬. বিবেকানন্দচরিতম্, ৭. নিগমানন্দচরিতম্, ৮. সিন্ধু সৌবীর সংগ্রামম্, ৯. শ্রীকৃষ্ণকৌতুকম্ ১০. রঘুবংশম্ ১১. কুমারসম্ভবম্

প্রকরণ— মাধুরীসুন্দরম্।

ভাণ— ১. বিধিবিপর্যাসম্, ২. পুরুষপুঙ্গবঃ।

ব্যায়োগ— ১. কৈলাসনাথবিজয়ম্, ২. গিরিধরসংবর্দ্ধনম্।

প্রহসন— ১. বিবাহবিড়ম্বনম্, ২. চণ্ডতাণ্ডবম্, ৩. ভট্টসঙ্কটনম্, ৪. পুরুষরমণীয়ম্, ৫. ক্ষুৎক্ষেমীয়ম্, ৬. শতবার্ষিকম্, ৭. চিপিটক-চর্বণম্, ৮. রাগবিরাগম্, ৯. বনভোজনম্, ১০. রামনামদাতব্য-চিকিৎসালয়ম্ ১১. দরিদ্রদুর্দৈবম্, ১২. চৌর-চাতুরীয়ম্ ১৩. নষ্টহাসম্।

তাঁর সমস্ত সাহিত্যকীর্তি এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে—

পাণ্ডববিক্রমম্—শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রণীত অষ্টাদশ সর্গান্ত মহাকাব্য এটি। গ্রন্থের নামকরণ থেকেই স্পষ্ট মহাভারতের কাহিনীই এর উপজীব্য। পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ পর্ব থেকে অজ্ঞাতবাসের পুরো কাহিনীকে আশ্রয়করে রচিত হয়েছে এই মহাকাব্য। মহাভারতের বনপর্বের শেষ অংশ থেকে শুরু হয়ে সম্পূর্ণ বিরাট পর্বের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে এই কাব্যে। প্রায় ১৫০০ শ্লোকে নিবদ্ধ মহাকাব্যটি। বীররস অঙ্গীরূপে এবং শান্তরস অঙ্গরূপে প্রযুক্ত। যেখানে সেখানে পাণ্ডবদের বীরগাথা মুখ্যরূপে চিত্রিত সেখানে বীর রসকে আশ্রয় করেছেন কবি।

কাব্যরচনার মাধ্যমে কেবল জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয়কেই জানা যায় না, কবির জীবন দর্শনও প্রতিবিম্বিত হয় কাব্যে। এই কাব্যেও দেখা যায় মানবজীবনে যে সমস্যাগুলি আসে, এবং কীভাবে তার মোকাবিলা করা যায় পাণ্ডবদের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে কবি তা

১১. 'অন্ধৈরন্ধস্য যষ্টিঃ প্রদীয়তে' ইতি রূপকং কেন বিরচিতম্?

উত্তর : নাট্যকারেণ ক্ষিতীশচন্দ্রচাটার্জীমহোদয়েন 'অন্ধৈরন্ধস্য যষ্টিঃ প্রদীয়তে' ইতি কৌতুকরূপকং বিরচিতম্।

উত্তর। নাট্যকারেণ ক্ষিতীশচন্দ্রচাটার্জীমহোদয়েন 'অন্ধৈরন্ধস্য যষ্টিঃ প্রদীয়তে' ইতি কৌতুকরূপকং বিরচিতম্।

১২. 'ষষ্টিতন্ত্রম্' কস্য কীদৃশং বা রচনম্?

১২. 'ষষ্টিতন্ত্রম্' কস্য কীদৃশং বা রচনম্?

উত্তর : ষষ্টিসংখ্যকানাং গল্পানাং সঙ্কলনম্ ষষ্টিতন্ত্রম্। রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবরঃ ক্ষিতীশচন্দ্রচাটার্জীমহোদয়ঃ।

উত্তর। ষষ্টিসংখ্যাকানাং গল্পানাং সঙ্কলনম্ ষষ্টিতন্ত্রম্। রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবরঃ ক্ষিতীশচন্দ্রচাটার্জী মহোদয়ঃ।

রমা চৌধুরী (১৯১১-১৯৯১)

'আমার ভেতর ও বাহিরে
অন্তরে অন্তরে আছো তুমি'।

যে রমণীর লেখনীদীপকের দীপ্তিতে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যাঙ্গান হয়েছে আলোকিত, যিনি বিংশশত্যধিক নাট্যপ্রদীপের বিচ্ছুরিত প্রভায় রমণীয় করেছেন স্বীয় সাহিত্যকীর্তিকে, যাঁর রচিত কাব্যসুধা হরণে সততই চপল সহৃদয়রূপ অলিগণ তিনি হলেন আনন্দমোহন বোসের পৌত্রী, সুধাংশুমোহন বোস দুহিতা, প্রাতঃস্মরণীয় যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর বিদুষী ভার্যা রমা চৌধুরী।

রমা চৌধুরী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ই ফ্রেব্রুয়ারী এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ প্রদেশের জয়সিদ্ধি অঞ্চলের বাসিন্দা। তাঁর পিতা ছিলেন ব্যারিস্টার এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের অধ্যক্ষ। লেখিকা ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্নাতকস্তরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তেকন্দে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তারপর তিনি প্রথম বাঙালী হিসাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল্ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন

করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলকাতার লেডী ব্রাবোর্ন কলেজে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। দশ বছর অধ্যাপনা করার পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘ আঠারো বছর উক্ত কলেজের অধ্যক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য নিযুক্ত হন। দীর্ঘ সাত বছর এই দায়িত্বভার বহন করেন। ১৯৯১ সালের ২০ ই মার্চ এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অকাল বিসর্জনে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে তমসা ঘনিয়ে আসে।

সাহিত্যকীর্তি —কাব্যের কারণ হিসাবে বেশীরভাগ আলংকারিক প্রতিভাকেই স্বীকার করেন। তাই অগ্নি পুরাণে বলা হয়েছে—

"এতাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ প্রসৃতমপি
বোপহসনীয় স্যাৎ"।

রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে প্রতিভাকে গুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) কারয়িত্রী প্রতিভা (২) ভাবয়িত্রী প্রতিভা।

কাব্য রচনা করতে সাহায্য করে কারয়িত্রী প্রতিভা এবং কাব্য সমালোচনা করতে সাহায্য করে ভাবয়িত্রী প্রতিভা। রমা চৌধুরীর মধ্যে দুই প্রতিভাই বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে কুড়িটির বেশী নাটক রচনা করেছেন। মনে করা হয় তিনিই প্রথম সংস্কৃত সাহিত্য জগতের প্রথম মহিলা নাট্যকার।

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— কবিকুলকোকিলম্, কবিকুলকমলম্, মেঘমেদূরমেদিনীয়ম্, শঙ্করশঙ্করম্, দেশদীপম্, নগরনূপুরম্, পল্লীকমলম্, সংসারামৃতম্, অভেদানন্দম্, নিবেদিতানিবেদনম্, যুগজীবনম্, ভারতাচার্যম্, রামচরিতমানসম্, ভারততাতম্, চৈতন্যচৈতন্যম্, রসময়রাসমণি, প্রসন্নপ্রসাদম্, গণদেবতানাটকম্, অগ্নিবীণানাটকম্, ভারতপথিকম্, যতীন্দ্রযতীন্দ্রম্, দশ বেদান্ত সম্প্রদায় ও বঙ্গাদেশ, নির্বাকদর্শন, বেদান্তদর্শন, সূফীদর্শন, ঋগ্বেদে নারী প্রভৃতি। এখন আমরা তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাটক আলোচনা করব।

নিবেদিতানিবেদিতম্ —ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও তাঁর পূণ্য পবিত্র মহিমামণ্ডিত কীর্তিধ্বজা উড্ডীন হয়েছে আলোচ্য নাটকে। নাটকটিতে বারোটি দৃশ্য আছে। ১৯৭৯ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটির নান্দী শ্লোকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করে নিবেদিতার স্তুতি করা হয়েছে। তিনি রুদ্রাক্ষমালাধারিণী, বিবেকচরণবন্দিনী, লক্ষ্যপালিনী, সারদা মায়ের পরমাদরিণী, অশেষ শক্তিশালিনী, মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণা, মোক্ষলাভের পথপ্রদায়িনী।

নাটকের প্রস্তাবনায় সুত্রধার ও নটীর কথোপকথনের মাধ্যমে মার্গারেট নোবেল বা ভগিনীনিবেদিতার চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বমণ্ডিত অবদানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্গারেটের প্রশ্নবান বিবেকানন্দকে,

বিবেকানন্দের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তরে মার্গারেট হলেন রোমাঞ্চিত, পুলকিত। তৃতীয় দৃশ্যে নিবেদিতা গুরুরূপে বরণ করতে এসেছেন স্বামীজীকে। স্বামীজী তখন মার্গারেটকে বলেছিলেন— "সৌম্যে! ততো নাহং তব গুরুঃ। তব গুরুস্তু জগদ্‌গুরুঃ শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবঃ নান্যো নান্যঃ"।

চতুর্থ দৃশ্যে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে জগৎসেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন— " হে মহাপ্রাণ, ওঠ জাগোঃ জগৎ সম্প্রতি যন্ত্রণাদগ্ধ। এখন কি তোমার নিদ্রা শোভা পায়?"

পঞ্চমদৃশ্যে মার্গারেটের সাথে মা সারদার সাক্ষাৎলাভ। মায়ের সাথে তাঁর মনের সাথে মনের মিলন, আত্মার সাথে আত্মার যোগসূত্র তৈরী হল। ষষ্ঠ দৃশ্যে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিকে সাক্ষীরেখে ব্রাহ্মমূহর্তে দীক্ষা দিলেন বিবেকানন্দ। মার্গারেট থেকে তিনি হলেন নিবেদিতা। এর পর প্রায় সমস্ত দৃশ্যগুলিতে মানবকল্যাণে তার কর্মযজ্ঞ বর্ণিত। ১৯১১ সালের ১৩ ই অক্টোবর এই মহীয়সী রমনীর মহাসমাধি হয়, যা চিত্রিত হয়েছে নাটকটির শেষ দৃশ্যে। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমূহুর্তেও তাঁর নির্ভিক, আত্মপ্রত্যয়ী অনন্য বাণী উচ্চারিত হয়েছে— "The boat is sinking, but I shall see the sunrise". (তরণী নিমজ্জিত প্রায়, কিন্তু আমি সূর্যোদয় দেখবই)।

আলোচ্য নাটকটিতে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা মুখ্য চরিত্র। এই দুটি চরিত্র ছাড়াও মা সারদা, বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ—স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, বৈজ্ঞানক ড. জগদীশচন্দ্র বসু, লেডী অবলা বসু, লেডী ইসাবেল্ মার্গসন, যোগীন্ মাতা, গোলাপ প্রভৃতি সহচরিত্র গুলিও নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বীর, করুণ ও শান্তরসের সম্মেলন সহৃদয়ের হৃদয়কে প্রহ্লাদিত করে। নাটকটির নাম — 'নিবেদিতা-নিবেদিতম্' গর্ভিতার্থের প্রকাশক— 'নামকার্যং নাট্যকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্'। পণ্ডিতপ্রবর রমারঞ্জন মুখার্জী নাটিকাটির সম্পর্কে বলেছেন— "Dr. Rama chowdhuri selects the theme of her drama 'Niveditā-Niveditam' from Rāmkṛṣṇa vivekānanda movement describes the life and activities of sister niveditā, the ardent devotee and disciple of Lord kṛṣṇa and svāmī vivekānanda."

সর্বোপরি নাটকটির প্রথম দৃশ্যে ভারবর্ষের চিরন্তন মর্মকথা অনুষ্টুপ ছন্দের সুললিত মাধুর্যে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা অতুলনী—

"ব্রহ্মাণ্ডমেব তদ্ ব্রহ্ম জীবশ্চ শিব এব সঃ।
মন্ত্রোহয়ং ভারতীয়ো হি বিতথো ন কথঞ্চন।।
দম্ভো ন জ্ঞানিনামেষ নৈষাস্তি কবিকল্পনা।
ভাবুকানাং ন ভাবোহয়ং স্বপ্নো ন স্বপ্নিনামসৌ।

প্রত্যক্ষরময়ং সত্যো দীপ্তসত্যশ্চিরন্তনঃ।।

যুগজীবনম্— শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনী এবং তার ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে এই নাটকটি লেখা। আলোচ্য নাটকে শব্দব্যবহারের স্বাধীনতা, গানের ব্যবহার, বাংলা শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। রমা চৌধুরীর নাটক রচনায় কারয়িত্রী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু শ্লোক রচনার প্রতিও যে তাঁর অসীম আগ্রহ এবং ক্ষমতা ছিল তা এই নাটকেই দেখতে পাই। তাঁর শ্লোকগুলিতে যেমন আছে ভাবুকতা, তেমনি আছে ভক্তিভাব। শুধু তাই নয় সঙ্গীতের আবেশও লক্ষণীয়। কখনো লোকপ্রচলিত বহুশ্রুত বাংলা গানের আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। যেমন—

'সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি মা-
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।

লেখিকা সংস্কৃতে বললেন—

'ইচ্ছাজাতং তব সর্বম্ ইচ্ছাময়ী তারাসি ত্বম্।
তব কর্ম করোষি ত্বং লোকে বদতি করোম্যহম্।'

আরও একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

'সুরাপান করিনা আমি,
সুধা খাই 'জয় কালী' বলে।
আমায় মন মাতালে মাতাল করে,
সব মদ মাতালে মাতাল বলে'।।

কবি বললেন এই ভাবে—

নাহং সুরাপানাসক্তঃ
'জয় কালী' ধ্বনি-বিধানপরঃ
কেবলং সুধাপানারক্তঃ
কেবলং জননীচরণধরঃ।।

এছাড়াও বাংলা শব্দকে সরাসরিভাবে এই নাটকে প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

' ন হি দেবপূজা যথেচ্ছখেলা'।

এখানে তিনি ক্রীড়া শব্দ ব্যবহার না করে 'খেলা' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। রামকৃষ্ণ দেবের বিখ্যাত উক্তি— 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' কে কবি বললেন— 'মুদ্রা মৃত্তিকা, মৃত্তিকা মুদ্রা' এইভাবে যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য রমা চৌধুরী সাবলীল মনোগ্রাহী রচনাশৈলীতে উপদিষ্ট করেছেন সহৃদয় সমীপে।

যতীন্দ্রযতীন্দ্রম্— রমা চৌধুরী স্বীয়পতি যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর জীবন অবলম্বনে আলোচ্য নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

নাটকটির স্থানে স্থানে কবির সংবেদনা, আবেগ, দুঃখানুভূতি, সহানুভূতি, রসানুভূতি অর্থাৎ মানব জীবনের সকল প্রকার অনুভূতিই প্রকাশিত হয়েছে। ভাষার সারল্য, বর্ণনা নৈপুণ্য, উৎকৃষ্ট রচনাশৈলী সর্বত্র পরিলক্ষিত।

রমা চৌধুরীর প্রায় সমস্ত নাটকই মহাপুরুষদের জীবনীকে আধার করে লেখা। যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী অর্থাৎ লেখিকার স্বামীও মহাপুরুষ সমগোত্রীয়। তাই লেখিকার অর্ঘ্য পাঠক সাদরে গ্রহণ করেছে। এই নাটকের ভাষা বাংলার মত সহজ, সরল ও সুখবোধ্য।

দেশদীপম্— আলোচ্য নাটকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরগাথা বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ মাতৃকাকে রক্ষার জন্য একত্রিত হয়। রহিম নামক চরিত্রটি গ্রামবাসীদের চিন্তাধারা বর্ণনা করে—

শ্রেষ্ঠং ব্রতং খলু জীবনস্য স্বদেশমাতুর্ণিয়তার্চনং যৎ।
আলোকরেখা ফলমম্বুবায়ুর্যস্যাঃ সদা রক্ষতি জীবনং নঃ।।
ধন্যং ভবেদর্জনমর্পণেন দানেন ধন্যং গ্রহণং হি লোকে।
যদর্জিতং জীবনমদ্য মাতুর্দেয়ং তদস্যৈ বহুমানপূর্বম্।।

এই নাটকে মর্কট, বৃক, কুক্কুট ইত্যাদি চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কয়েকটি চরিত্র বিদুষক প্রকৃতির। চম্পকবদন ও অভ্রপ্রতিম নামে দুই গ্রাম্য যুবক দেশরক্ষার যুদ্ধে সামিল হয়। তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাই আমরা দেখি চম্পকবদনের মৃত্যুতেও দেশদীপ জাগ্রত থাকে। অর্থাৎ চম্পকবদনের মতো নায়ক ভারতমাতার কোলে অসংখ্য জন্ম নিয়েছে যাদের জীবন ভারতমাতার স্বাধীনতা যজ্ঞে আহুতির জন্য প্রস্তুত। তাই দেশদীপ অর্থাৎ ভারতমাতার দীপ অর্থাৎ মহিমা সর্বদা প্রজ্জ্বলিত।

পল্লীকমলম্— লোককথাকে অবলম্বন করে রচিত এই নাটক নটি দৃশ্যে মণিত হয়েছে। নাটকের নায়ক রূপকুমর, নায়িকা কমলকলিকা। দুজনের প্রণয়কাহিনী নাটকটির মূল বিষয়বস্তু। আলোচ্য নাটকে আধুনিক চলচিত্রের মত পট পরিবর্তন করে রমা চৌধুরী পূর্বকাহিনী বর্ণনা করেছেন। বঙ্গদেশের গ্রাম্য জীবন, সংস্কৃতি, লোকক্তি এখনে প্রকাশিত। আমরা সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলি সেগুলিকেই সংস্কৃতে রূপদান করেছেন কবি। যেমন—

'কক্ষৌ ক্ষুধা মুখে লজ্জা।'
'পথি ঠক্কুর আদ্রিয়মাণো মস্তক মারোহাত' ইত্যাদি।

কবিকুলকোকিলম্— কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী আমরা সবাই অবগত। তাঁর মূর্খতা ছিল সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিনিই বাগ্‌দেবীর বরে সংস্কৃতসাহিত্যের কবিবর হয়ে ওঠেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন রূপে বিরাজ করেন এবং রাজা কর্তৃক কবিসার্বভৌম উপাধি লাভ করেন। নাটকের নায়িকা কালিদাস কলত্র বিদ্যাবতী। তাঁর অপমানেই গৃহত্যাগী হয়ে সরস্বতীর বরে কবিশ্রেষ্ঠ হন। পরে কালিদাসের প্রতিভায় তুষ্ট

হয়ে পতিকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেন বিদুষী বিদ্যাবতী। নাটকটির দশ দৃশ্য সমন্বিত। উজ্জয়িনীর কালিদাস সমারোহে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি অভিনীত হয় এবং পুরস্কৃত হয়। কবিকুলকমলম্ নাটকটির উপজীব্যও কালিদাসের জীবনী।

সংসারামৃতম্— একটি দরিদ্রপরিবারে কন্যার দুঃখমণ্ডিত জীবনকাহিনীকে নিয়ে লেখা আলাচ্য নাটকটি? সপ্তদৃশ্যে দৃশ্যায়িত এটি। ময়ূখ নামে কোন এক ব্যক্তি মেয়েটিকে প্রতারিত করে। প্রতারিতা নায়িকা পরে ময়ূখ নামক ধনী ব্যক্তিকে বিবাহ করে। কিন্তু সেই ময়ূখ চরিত্রহীন ছিল। কিন্তু সেই অসৎচরিত্র পতি মেয়েটির সংস্পর্শে তার সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে সৎপথে ফিরে এসে নবজীবন সূচনা করে। নাটকটির পুরো কাহিনী অত্যন্ত বাস্তবোচিত।

মেঘমেদূরমেদিনীয়ম্— কালিদাস রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত গীতিকাব্য মেঘদূতকে অবলম্বন করে নয়টি দৃশ্যে রচিত আলোচ্য নাটকটি। নাটকটি সম্পর্কে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের জননী স্বরূপা ঋতা চট্টোপাধ্যায় মহোদয়া বলেছেন— "This drama depicts, the same, in a lively poetic manner and is, as such a new welcome contribution to the vast and variegated meghadūta literature."

এছাড়াও আছে 'নগরনূপুরম্' (ময়ূখের কথাকে আশ্রয় করে দশ দৃশ্যে লেখা), 'অভেদানন্দম' (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য অভেদনন্দের জীবনগাথা বারোটি দৃশ্য সম্বলিত), 'ভারতাচার্যম্' (বারটি দৃশ্যে চিত্রিত ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবনী), 'রামচরিতমানসম্' (তুলসীদাস কীভাবে পত্নীর অনুপ্রেরণায় রামচরিতমানস লিখেছিলেন সেই কথা বর্ণিত), 'ভারততাপম্' (মহাত্মাগান্ধীর কর্মজীবন ছটি দৃশ্যে লেখা), 'চৈতন্যচৈতন্যম্' (পনেরটি দৃশ্যে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম ও জীবনী বর্ণিত), 'রসময়রাসমণি' (রাণীরাসমণির আদর্শ জীবন আটটি দৃশ্যে চিত্রিত), 'প্রসন্নপ্রসাদম্' (সাধক রামপ্রসাদের জীবনী দশ দৃশ্যে চিত্রিত), 'গণদেবতানাটকম্' (বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী), 'অগ্নিবীণানাটকম্' (বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী), 'ভারতপথিকম্' (রামমোহন রায়ের জীবনী পনেরটি দৃশ্যে লেখা)।

নির্যাস— রমা চৌধুরী আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম মহিলা গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। যার রচনার দ্বারা আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষীণা তনুতে মেদ সঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর যথার্থ সহধর্মিনী তিনি। তাঁর মধ্যে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার সম্মেলন সাধিত হয়েছে। তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— সমস্ত মহাপুরুষের মহত্ত্বমণ্ডিত, বীরত্বপূর্ণ, পবিত্র জীবনগাথা তাঁর নাট্যের প্রধান উপজীব্য। কেবলমাত্র 'পল্লীকমলম্' নাটকটি লোককথা অবলম্বনে লেখা। আর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় তাঁর নাট্যগুলিতে দেখা যায় তা হল অলংকারশাস্ত্র মতে নাট্যের অধ্যায়গুলি 'অঙ্ক' নামে

অভিহিত হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাটকের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন—

'.......পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ'।

অর্থাৎ নাটকের অধ্যায় অঙ্ক নামে পরিচিত হবে এবং তার সংখ্যা পাঁচের কম নয়, দশের বেশী নয়। কিন্তু রমা চৌধুরী মহোদয়া তাঁর নাটকের অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন— 'দৃশ্য'। যতীন্দ্রবিমলের মতো তিনিও নাটকের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে কবিতা রচনার প্রাচীন রীতিকে লঙ্ঘন করেন নি। শুধু তাই নয় স্বরচিত শ্লোকবদ্ধ সঙ্গীতের আবেশও লক্ষণীয়। নাটকের মধ্যে শ্লোকের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কখনো বর্ণনীয় বিষয়কে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। যেমন— 'পল্লীকমলম্' নাটকে রূপকুমার ও কমলকলিকার প্রেমমাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শ্লোককে আশ্রয় করেছেন। নায়িকার শাড়ী প্রবল বায়ুবেগে যখন নদীতে পতিত হল, তখন সে নদীর স্তুতি করে বলল—

'কলকলকলনা হিমগিরিললনা ললতি ললিতা লোভনা।
বিলুলিতচলনা বিকসিতবলনা ললাটাভরণশোভনা।।'

অনুপ্রাস অলংকারে নিবদ্ধমান শ্লোকটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। ছন্দ, অলংকার প্রয়োগের সাথে অদ্বৈত বেদান্তে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তা 'নিবেদিতানিবেদম্' এবং 'শঙ্করাশঙ্করম্' নাট্যদ্বয়ে প্রতিফলিত হয়। পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ভাষার সারল্য, অলংকার নৈপুণ্য, গীতিময়তা, অনবদ্য ভাবধর্মিতা, ব্যঞ্জনাধর্মিতা, তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহার প্রভৃতির সমন্বয়ে বিরচিত তাঁর নাট্যগুলি আমাদের হৃদয়াসনে চিরকাল আসীন থাকবে। তাই অন্তিমে বলতে ইচ্ছা করে —

'তুমি রবে নীরবে
হৃদয়ে মম।

রচনাধর্মীপ্রশ্নোত্তরঃ

প্রঃ— আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে রমাচৌধুরীর অবদানবিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা

... সংস্কৃত সাহিত্যের তিনিই

পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬-১৯৪০)

তব সৌরভে সুরভিত সংস্কৃত-সাহিত্যকানন।
নমি তোমায় শিবসম হে পঞ্চানন।।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশপরগণা জেলার ভাটপাড়ায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৩ বঙ্গাব্দের ৯ ই ভাদ্র) মহাপণ্ডিত দেশপ্রেমী পঞ্চনন তর্করত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নন্দলাল বিদ্যারত্ন। অর্থাৎ তিনি বাল্যকাল থেকেই শিক্ষার পরিবেশেই বড় হন। পঞ্চানন পুরাণ, মহাকাব্য, দর্শন, কাব্য, ন্যায়, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর লেখনীর অবাধ বিচরণ ছিল। তবে এই জ্ঞানতপস্বীর ন্যায়দর্শনে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শিক্ষাগ্রহণ সমাপনান্তে তিনি বঙ্গাবাসী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে বঙ্গাবাসী কলেজে অধ্যাপনা ত্যাগ করে স্বগৃহে ন্যায়দর্শন পড়াতে শুরু করেন। তিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তা নয়, ভারতমাতার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অপরাধে কারাবরণ করেন। কারাগারে তাঁর সাথে ছিলেন আরও এক দেশপ্রেমিক জ্ঞানতপস্বী ঋষি অরবিন্দ (শ্রী অরবিন্দ ঘোষ)। তাঁর দয়ালুতা, দেশপ্রেম ও সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁকে প্রবাদপ্রতীম করেছে। তাই ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। মনে হয় এই উপাধি তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি আমৃত্যু বর্ণাশ্রম মূলক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৬৩০ বঙ্গাব্দে তিনি দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ২৬ শে আশ্বিন) এই মহানজীবন-প্রদীপ অস্তমিত হয়ে যায়।

কাব্যকীর্তি— পুরুষোত্তম, পণ্ডিতাগ্রণ্য, জ্ঞানতপস্বী এই মনিষী কেবলমাত্র ন্যায়দর্শনেই পণ্ডিত ছিলেন না, কাব্যের সমস্ত শাখাতেই তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাঁর কাব্যগুলি হল—

কাব্য—শোককবিতাবলী, পার্থাশ্বমেধমহাকাব্যম্, সর্বমঙ্গালোদয়ঃ, শ্রীবিষ্ণুবিক্রমম্, মুকুন্দদেবাত্মনিদর্শম্, শ্রীরাজপ্রশস্তি, প্রাণদূতম্, দ্বৈতোক্তিরত্নমালা, শাক্তবাদসারঃ, মন্ত্রমহিমরহস্যম্, স্তোত্রাবলী, জীবানুশাসনম্, মাতৃকাপ্রশস্তি, ধর্মসিদ্ধান্ত।

নাটক—অমরমঙ্গালম্ , কলঙ্কমোচনম্।

টীকা— দেবীভাষা (চণ্ডী), পূর্ণিমা (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী), পরিষ্কারঃ (বৈশেষিক), শক্তিভাষ্যম্ (ঈশোপনিষদ্), ব্রহ্মসূত্রম্ (গীতাভাষ্যম্)।

সম্পাদনা—মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, দেবীভাগবত, খিলহরিহবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

বাংলাভাষায় অনুবাদ—মনুসংহিতা, ঊনবিংশতিসংহিতা, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, দশকুমারচরিত, মালতীমাধব, রত্নাবলী, পঞ্চদশী, কামসূত্র।

তাঁর কবিকর্ম অসংখ্য। সবগুলি ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁর সমস্ত সাহিত্যকীর্তির মধ্যে 'অমরমঙ্গালম্' নাটকটি সহৃদয়াসনে তাঁকে চিরাসীন করেছে। অধুনা এই নাটকটি সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করব।

অমরমঙ্গালম্— মেবারের রাজা রাণাপ্রতাপ। রাণাপ্রতাপের বীর পুত্র অমরসিংহ। অমরসিংহের অমরজীবনী অবলম্বন করে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি রচনা করেন পঞ্চানন তর্করত্ন। শ্লেষ এবং বিরোধাভাস অলংকারে অলংকৃত নাটকের নান্দী শ্লোকটি।

আলোচ্য নাটকের নায়ক অমরসিংহ, প্রতিনায়ক মানসিংহ। মানসিংহের বিশ্বস্ত অনুচর সমরসিংহ অমরসিংহকে বশীভূত করার জন্য, মার্গচ্যুত করার অভিলাষে বীরা নামে এক ললনাকে নিয়োগ করে মেবারে প্রেরণ করে। রাণাপ্রতাপ এবং অমরসিংহের গুণ ও অতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে বীরা অমরসিংহকে ভালোবেসে ফেলেন। তারপর বীরা একলিঙ্গানাথ (শিব) এর ভক্তা হয়ে সিদ্ধা তাপসী হয়ে যান। অমরসিংহ যুদ্ধের দ্বারা দেশের শান্তি ভঙ্গ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মানসিংহের পরিকল্পনাকে তিনি চতুরতার সাথে বুদ্ধিবলে প্রতিকার করেছিলেন। একলিঙ্গানাথ মন্দিরের পূজারী মানসিংহ প্রেরিত পূজার সামগ্রী গ্রহণ করেন নি। তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন মানসিংহ এবং মেবার আক্রমণের জন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন। সময়াগমে মানসিংহ ও অমরসিংহের মহাযুদ্ধে অমরসিংহ জয়লাভ করেন। বিজয়ী হওয়ার পর পিতৃব্য সাগরসিংহকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করে নিজে চিতোর দুর্গে গমন করেন। বীরা (নায়িকা) তখনও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছিলেন, বিবাহ করেননি। দৈববানী রূপে অমরসিংহ রাণাপ্রতাপের আশীর্বাদ পান। এইভাবে প্রতাপের আশীর্বচন রূপ ভরতবাক্যের দ্বারা নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নির্যাস— পঞ্চাননের রচনাশৈলী সুন্দর, সাবলীল, মাধুর্য ও প্রসাদ গুণান্বিত। মাতৃভূমির প্রতি অমরসিংহের উক্তিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়—

ভগবতি। চিতোর বসুন্ধরে।
আজীবণং ভবদুপাসনমেব ধর্ম-
স্তদ্‌গৌরবায় মরণঞ্চ সুখং মদীয়ম্।
তেষাং ত্বদভ্যুদয়দর্শনবঞ্চিতানাং
মার্তয়স্ব তনুজেষু ভবপ্রসন্না।।

পূর্বেই বলা হয়েছে পঞ্চানন তর্করত্নের ভাষা ওজগুণযুক্ত, সমাসবহুল, দুর্বোধ্য নয়।

অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল তাঁর বর্ণনা ক্ষমতা। বাস্তব বিষয় চিত্রণেও তিনি অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। একটি অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনায় কবির এই ক্ষমতা প্রকাশিত—

বংশগ্রন্থিবিভেদসম্ভবরবৈরাপূর্য্যতে দিঙ্মুখং
তারোস্কাসদৃশৈঃ স্ফুলিঙ্গানিচয়ৈরাকাসমাচ্ছাদ্যতে।
হাহকারবিমিশ্রিতঃ কলকলোঽপ্যেষ ক্রমাদ্ বর্ধতে।।

পঞ্চানন তর্করত্নের ভাব ও ভাষার হৃদয়গ্রাহিতা অতি সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। তিনি যে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তাও কোথাও কোথাও তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। ব্রহ্মসূত্র, গীতাভাষ্যে তে সুস্পষ্টভাবে তা লক্ষ্যণীয়। আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম রূপকার তিনি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র শ্রীজীব এবং অন্যান্য কবিগণ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যকে অপ্রতিম রূপ দান করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিভাবলে এক ঐতিহাসিক কাহিনীকে রসময় করে সহৃদয়ের হৃদয়কে রসগ্রাহী করেছেন। 'অমরমঙ্গলম্' নাটকের দ্বারা। তাই ঋতা চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ার যথার্থ উক্তি— "Amaramangalam a historical play, a rare combination of poetic and dramatic elements testified to author's prodound scholarship and nonparcil poetic brilliance by virtue of which it seems to endear itself to generation of sanskrit lovers."

অন্তিমে এই দেশপ্রেমিক, শাস্ত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম, পণ্ডিতবর আধুনিক কালের কবিমার্গের প্রদর্শক মহেশ্বরসম পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের প্রতি হৃদয়াবেগ উচ্ছলিত—

'যা পেয়েছি, যা হয়েছি
যা কিছু মোর আশা।
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।।'

রচনাধর্মীপ্রশ্নোত্তরঃ

প্রঃ— আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে পঞ্চাননতর্করত্নের অবদান বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ ঃ—

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালেন ফলেন তীর্থং সদ্য সাধুসমাগমঃ।।

যে সংস্কৃতরসিক সাহিত্যানুরাগির সাধুসমা... তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে, তিনি...